ইচ্ছামতী

শীত সংখ্যা ২০১১

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃশীত সংখ্যা ২০১১........1

মজার পাতা: বল তো দেখি কি?........3

ছড়া-কবিতা........5

নিঝুম দুপুরে........5

শীত কি এলো........6

কেষ্ট পাড়ুই........7

শীতের ছড়া........8

পুঁটের সর্দারি........9

ঠাকুমার ঝুলি........11

গল্প-স্বল্প........12

কুলতলির ময়নামাসি........12

ইলিশ........16

বিদেশী রূপকথা: ছয় রাজহাঁসের গল্প........24

পড়ে পাওয়া: নাড়ুবাবুর পেন উদ্ধার........29

পুরাণকথা: বোকা উগংয়ের গল্প........31

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ২........33

শিল্পের ইউরোপ: পর্ব ২........35

বায়োস্কোপের বারোকথা: কলকাতায় প্রথম যুগের সিনেমা -পর্ব ২........46

পরশমণি: সমুদ্রের জল আর বৃষ্টির জল........49

আঁকিবুকি........52

প্রথম পাতাঃশীত সংখ্যা ২০১১

শীত এবারে বেশ ভালই পড়েছে। উত্তর দিক থেকে হু হু করে ছুটে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, দিনের বেলা সূর্যের আলোটা কি আরাম আরাম লাগছে...রাতে মনে হচ্ছে কম্বলের তলা থেকে বেরোবোই না... কি ভাবছ, চাঁদের বুড়ির কি আবার শীতও লাগে নাকি? লাগে বাপু লাগে! চাঁদের বুড়িরও শীত লাগে, ইচ্ছামতীরও লাগে। তাই তো পৌষের রোদে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কমলালেবু খেতে খেতে আমি আর ইচ্ছামতী একটু বেশি আলসেমি করে ফেললাম। আর সেজে গুজে আসতে দেরীও করলাম একটু। আসার পথে আবার শীতবুড়োর সাথে দেখা। শনের নুড়ির মত চুল দাড়ি নেড়ে, ঠকঠক করে লাঠি ঠুকে ঠুকে আসছে। তাকে বললাম- তুমি বড় গোলমেলে লোক! খামোখা শীতে কাবু করছ আমাদের। এই কথা শুনে সেই বুড়ো ফোকলা মুখে হেসে বলল- খালি ঠাণ্ডাটাই দেখলে, আর ওদিকে যে বাগান ভরে রঙিন ফুল এনে দিলাম, নানারকমের সব্জী আর ফল এনে দিলাম, সে তো কই বললে না? ইশকুলে ছুটি পাচ্ছ, সে ছুটিতে চড়ুইভাতি করতে যাচ্ছ, এদিক সেদিক বেড়াতে যাচ্ছ, ঘামে হাঁসফাঁস করছ না - কই সে তো ভাবছ না?

এই কথা শুনে আমি আর ইচ্ছামতী ভেবে দেখলাম, বুড়ো তো ঠিক কথাই বলেছে; এদিকটা তো আগে ভেবে দেখা হয়নি। তাই আমি আর ইচ্ছামতী দুজনে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললাম- ঠিক, ঠিক, আমরা একথা তো ভুলেই গেছিলাম।

ওদিকে শীতবুড়ো তো আমাদের কথায় গোঁসা করে, নিজের ঝুলি থেকে আরো খানিক উত্তুরে হাওয়া বার করে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলল- বেশ বেশ, আমি চলে যাব শীগ্‌গির, আর গিয়েই পাঠাব গ্রীষ্মকে। দেখ তখন বেশি মজা হয় কিনা - এই বলে ফোকলা গাল ফুলিয়ে উল্টোবাগে হাঁটা

দিল। ইচ্ছামতী তখন ছুটে গিয়ে তার হাত টেনে ধরল, আর আমি তাকে বললাম - আহাঃ, এত রাগ কর কেন, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যেও না, ইচ্ছামতীর নতুন শীত সংখ্যা আসছে, বন্ধুরা সেটা পড়ে শেষ করা অবধি নাহয় থাক। তোমার গায়ে দেওয়ার জন্য নকশী কাঁথা দেব, গরম গরম আস্কে পিঠে বানিয়ে দেব, বসে বরং খাও, আর আমাদের একটু শীতের আমেজ নিতে দাও।
বুড়ো এত সব ভাল ভাল কথা শুনে মুচকি হেসে বলল- আর নলেন গুড়ের পায়েস খাওয়াবে না?
আমি বললাম - তাও খাওয়াবো।

তা এই যে সবে পৌষ সংক্রান্তি গেল, তুমিও কি খেলে? নরম গরম পিঠেপুলি? আর কি কি করছ এই শীতে? বেড়াতে গেলে কোথাও? ফাঁক পেলে রোদ্দুরে খুব খানিকটা খেলে নিলে? বড়দিনের উতসব, আর নতুন ইংরেজি বছরের আনন্দ তো সবে গেল। এখনও সামনে আছে নেতাজীর জন্মদিন, প্রজাতন্ত্র দিবসের আড়ম্বর আর হ্যাঁ, অবশ্যই সরস্বতী পুজো। এই সব বাদ দিয়ে কি আর শীত কাল হয় বল

আর শীতের রোদ মাখা আমেজ নিয়েই এসে গেল ইচ্ছামতীর নতুন শীত সংখ্যা ২০১১। লেপের ওম, কমলালেবু আর নানারঙা চন্দ্রমল্লিকার সাথে এই শীতের শেষ কটা দিনে তোমার সাথে থাকুক ইচ্ছামতী।

ভাল থেকো।

চাঁদের বুড়ি
৩রা মাঘ, ১৪১৭
১৮ই জানুয়ারী, ২০১১
মঙ্গলবার

মজার পাতা: বল তো দেখি কি?

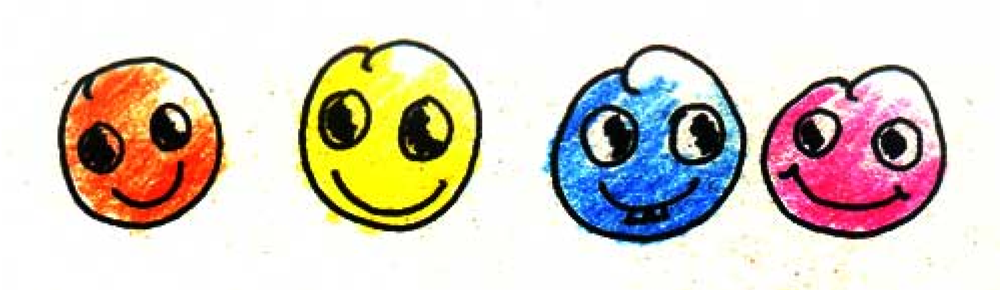

১. অন্তরেতে শুষ্ক সে যে জল নাহি তায়,
প্রথমার্দ্ধে মহাশক্তিমান,
আদি অন্তে জাতি দেখি অনার্য্যের প্রায়,
চারে মিলে পতঙ্গ সৃজন।

২. দশা বড় ভালো নয়,প্রথমার্দ্ধে তার,
চারে মিলে দশ হয়, মুখেতে যাহার।

৩. প্রথম দুইয়েতে বৃক্ষ, শেষ দুইয়ে লোকের বাস,
চারে মিলে পূজনীয়, দেবপূজা বারোমাস।

৪.পাখি বলে সবে জানে, প্রথম দুইঅক্ষরে মীন,
শেষদুইয়ে লালবর্ণ, ভেবে নাম বলা সমীচীন।

৫. তরল আছে যার প্রথমার্দ্ধে, বৃত্ত অবশেষে,
চারে, উৎসবের মধ্যমণি, মিষ্টান্ন বিশেষে।

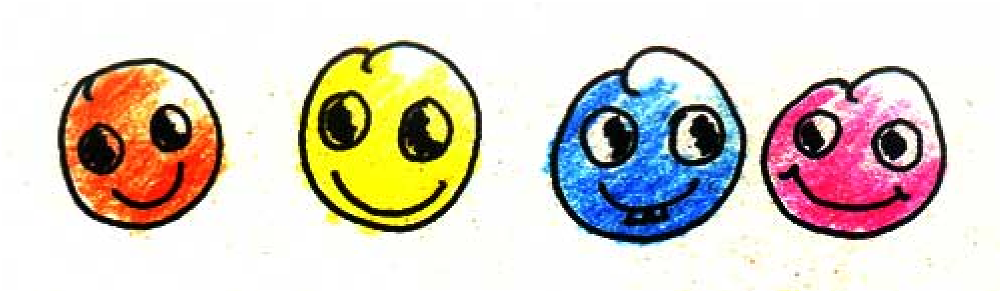

উত্তরমালা

১. ভীমরুল

২. দশানন

৩. শালগ্রাম

৪. মাছরাঙা

৫.রসগোল্লা

অধ্যাপক জি. সি. ভট্টাচার্য
বারানসী, উত্তর প্রদেশ

ছড়া-কবিতা

নিঝুম দুপুরে

নিঝুম দুপুরে আমি আনমনে
জানলার দিকে চেয়ে দেখি
পুরোনো দিনের গল্পে ব্যস্ত
তালগাছ আর কালোদীঘি

পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে ওড়ে আর ডাকে
কোন দুর দেশে দেয় পাড়ি
ভিজে শাড়ি মেলা বাড়ির পাঁচিলে
দুই শালিকের ভাব আড়ি

ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমী বুঝি
গল্প জুড়েছে ঐ ছাদে
রূপবতী সেই রাজকন্যে
বন্দিনী কোন প্রাসাদে

সারাটা দুপুর শীত রোদ্দুর
দেয় স্বপ্নের হাতছানি
ঘুম ঘুম চোখে তবু চেয়ে থাকি
সামনে পড়ার বইখানি।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

শীত কি এলো

হিমেল আলো আমায় এসে বললো কি
নতুন ধানের গন্ধ মেখে
রূপকথা-নীল আকাশ থেকে
পৌষরঙা দীপের আলো জ্বললো কি?
তিলের ফুলের পাপড়ি থেকে
শীত-পাখিরা গন্ধ মেখে
দখিন দেশে খবর দিতে চললো কি?
সরষে ক্ষেতের আলোর ভাঁজে
শিশির মাখা ঘুমের সাজে
মিষ্টি আলো নতুন কথা বললো কি?

তন্ময় ধর
নবগ্রাম, হুগলি

কেষ্ট পাড়ুই

মহুলটাঁড়ের রাস্তা ধরে ভরদুপুরে
শুনছি নাকি কেষ্ট পাড়ুই যাচ্ছে ট্যুড়ে?
সঙ্গে আছে মউরা পাড়ার নিতাই বেনে
ঝোলায় কি তার মন্ডা-মিঠাই? নাও তো জেনে-
এই তো সেদিন বনের পথে দাঁতাল এসে
মনসা মুদির ভাইকে পেয়ে ধরল ঠেসে।
কেড়ে নিল ঝোলাটা তার কাঁঠাল ভেবে
তেমনি আজও মন্ডা-মিঠাই কেড়ে নেবে।
থামাও তাকে আগেভাগে ডাক কাছে,
অসময়ে ট্যুরে গিয়ে কি লাভ আছে?
ইলিশ রেঁধে খাওয়াশ টাকে ভালোবেসে
কাদা মাটি গায়ে মেখে থাকুক দেশে!

তরুন কুমার সরখেল
উত্তর আমডিহা, পুরুলিয়া

শীতের ছড়া

শীতটা তো কম নয়
পড়ছে বেশ জাঁকিয়ে
কনকনে উত্তুরে
হাওয়া দেয় কাঁপিয়ে
জবুথবু রোদ্দুর
ঘোরে না আর দাপিয়ে।
ফুলেদের শীত নেই
তাই তারা হাসছে
হাঁসেদের ভয় নেই
তাই জলে ভাসছে।
অনুতাপ নেই কোন
ঝর্ণা কি পাহাড়ের।
প্রকৃতির মাঝে তবু
সজ্জা কী বাহারের।

জামাল ভড়
বারাসাত, উত্তর চব্বিশ পরগনা

পুঁটের সর্দারি

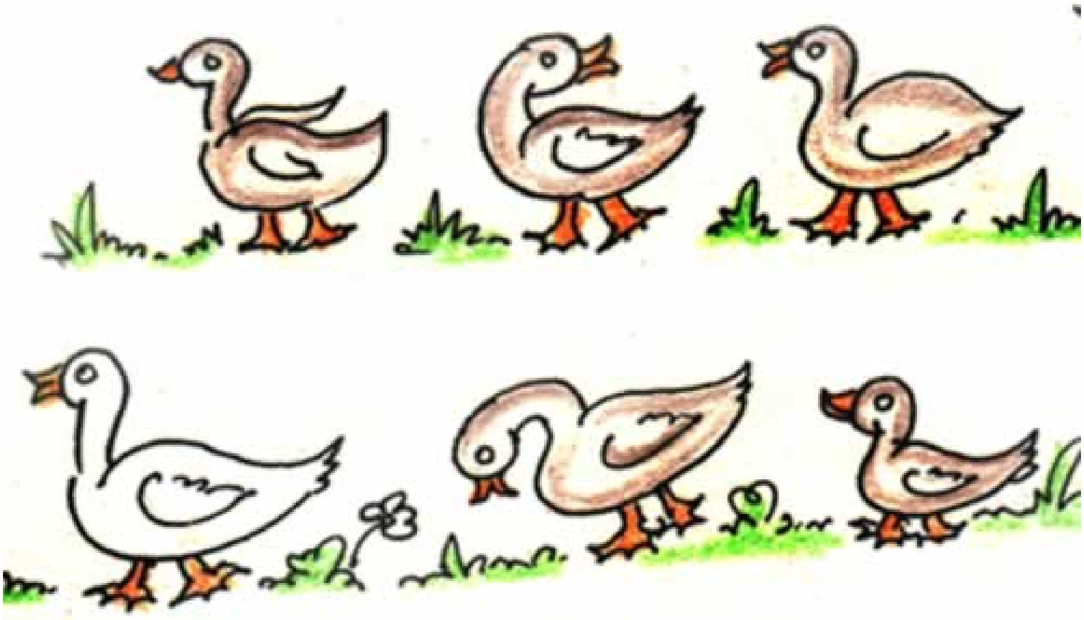

ছয় ছয়টা পাতি হাঁসের ছানা!
সব্বাই আমার পোষ মানা।
দুটো বেশ মোটা মোটা
গুগলি খায় গোটাগোটা।
আর দুটো প্যাঁকাটে
অরুচি তাদের খাওয়াতে।

নাম দিয়েছি রাধা যেটার,
ধবধবে সাদা রঙ যে তার।
তবে, পুঁটে যেটা সবার চেয়ে,
হাবে ভাবে মহারানী! সর্দারী সবেতে!
পিঠের পালকখানি উঁচিয়ে,
হাঁটতে হবেই তাকে সবার থেকে এগিয়ে।

হেলে দুলে দুলকি চালে
চলেন পুঁটে রানী,
সকলের আগে আগে
উঁচিয়ে পিঠের পালকখানি।
তার পিছে বাকি সব
সার বেঁধে চলে।
একে একে ঝাঁপ দেয়
পুকুরের জলে।

সারাটা দিন দস্যিপনা
সামলানো যে দায়!
অথচ, ছোট্ট পুঁটের কোন শাসনে
ওরা অমন সার বেঁধে ধায়?

শিব শঙ্কর বসু
এপেক্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ঠাকুমার ঝুলি

বল দিকি ঠাকুমার নাতি আর পুতিরা
ঠাকুমার ঝুলি থেকে উঁকি মারে কাহারা?
বই থাকে, থাকে পেন আর থাকে পামটপ,
মাউসের সুড়সুড়ি হাতে ধরে থপথপ।
আর আছে আইপড ঝোলে তার দু-সূতো
গান আছে স্টোর করা রক-পপ কত শত।
আখাম্বা ব্ল্যাকবেরী আছে কোথা লুকিয়ে
ঠাকুমা ডায়রী লেখে, সদা চোখ পাকিয়ে।
সূতোবাঁধা চশমা ফেলে দিয়ে সজোরে
ঠাকুমা পরেন লেন্স দুচোখের ভেতরে।
ঝুলিতে রাখেন তিনি হরিপদো-রাউলিং
হনুমান-রাম-সীতা তবুও যে ডার্লিং।
ঠাকুমা যে দিনভর টিভি খোলে বাড়িতে
ফোনের লাইনে থাকে দুটি কথা কইতে।
গাড়িতে চলতে থাকে অবিরত রেডিও,
মেসেজ নখের ডগে, শুধু তুমি পড়িও।
মোবাইল নিজে তিনি, সেলুলার ওজনে,
ক'জন বুঝেছে তাকে নাতি-পুতি-স্বজনে?

ইন্দিরা মুখার্জি
কলকাতা

গল্প-স্বল্প

কুলতলির ময়নামাসি

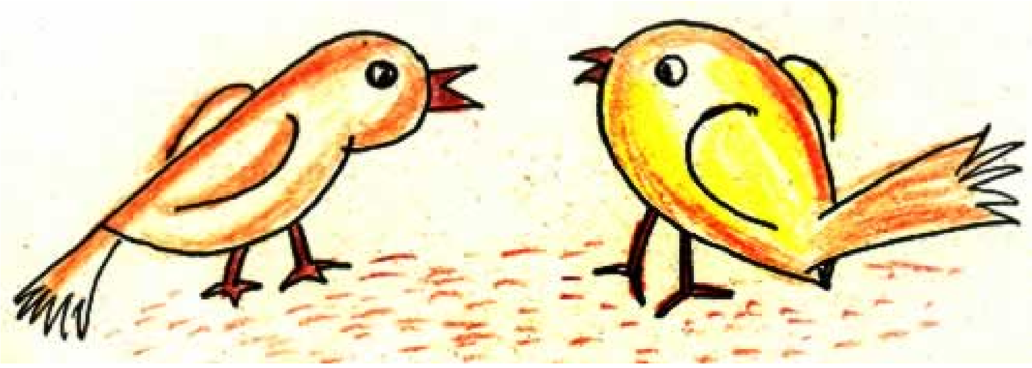

কুলতলির ময়নামাসি সেদিন উড়ে এল পলাশপুরে। পলাশপুরে গিয়ে পৌঁছোল শালিকদিদির কাছে।

-কী ব্যাপার ময়নামাসি হঠাৎ এলে যে হেথা?- শালিকদিদি বলল।

-কাজে এসেছি বোন, ভীষণ জরুরি কাজ। ছেলেটাতো বড়ো হয়েছে, ইয়ে পাশ করেছে একটা, বে থা তো দিতে হবে।

- ও এ তো খুবই ভালো খবর। তা মেয়ে ঠিক করে দিতে হবে, এই তো?- শালিকদিদি বলল। ময়নামাসি বলল, তা যা বলেছিস্;

-তা তোমার ছেলের কী কী শখ আছে মাসি?

-সে গাইতে জানে, সে নাইতে জানে, সে ধুলোবালি মাখতে জানে। গোরুর পিঠে চড়তে জানে, মানুষ

-খোকাদের ঠোকরাতে জানে।

-বাব্বা তবে তো দেখছি ছেলে অনেক কিছু শিখেছে- শালিকদিদি বলল।

-কার ছেলে তা তো দেখতে হবে।- বেশ গর্বের সঙ্গে বলল ময়নামাসি।তারপরই বলল, তা শুধু কথাই বলবি, না কিছু খেতে দিবি?

-কী খাবে বলো।-শালিকদিদি বলল।

-কী রেখেছিস শুনি?

-কেঁচো আছে, বাদামের খোসা আছে, আখের ছোবড়া আছে জ্যান্ত পোকামাকড়ও আছে।

ময়নামাসি বলল, কুলতমিতে আজকাল আমাদের অনেক প্রতিষ্ঠা হয়েছে বুঝলি, আমরা একটু আধটু বড়োলোকও হয়েছি, কাজেই ফলের বিচিই দে, সেটা খাওয়াই ঠিক হবে। পোকামাকড় গরিবেরা খাক, কি বলিস?

শালিকদিদি বলল, তা যা বলেছ। বলেই তিনটি খেজুর-বিচি খেতে দিল ময়নামাসিকে। চেটেপুটে তাই

খেল ময়নামাসি। তার পর বলল, চল্ এবারে, মেয়ে দেখতে যেতে হবে। শালিকদিদি ময়নামাসিকে নিয়ে উড়ে চলল কুসুমপাড়ায়। কুসুমপাড়ায় থাকে শালিকদিদির বন্ধু কুসুমদিদি। তাকে সবাই বলে কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি।

কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি পলাশপুরের শালিকদিদিকে দেখে তো খুব খুশি।

পলাশপুরের শালিকদিদি বলল, তোর তো একটা মেয়ে আছে?

-হ্যাঁ তা তো আছে।

-ওর জন্য বিয়ের খবর নিয়ে এসেছি।-পলাশপুরের শালিক বলল।

-এ তো খুবই ভালো খবর।- কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি বলল।

-এরই জন্য তো ময়নামাসি এসেছে। কুলতুলির ময়নামাসি। বড়ো উচ্চ ঘর ওদের, সাত পুরুষ ধরে ওরা ওখানে আছে, নিজস্ব ঘরবাড়ি। খেত-খামার চারদিকে রয়েছে, খাবারদাবাদের কোন অভাব নেই। ওরই ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়।

-বাঃ এ তো খুবই ভালো খবর। তা কিছু মিষ্টিমুখ তো আগে করতে হবে। বলল কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি।

-না না তার দরকার নেই। পলাশপুরেই খেয়ে এসেছি- বলল ময়নামাসি।

-তা কি হয়? দুটো আখের ছিবড়ে দিচ্ছি, একটু চেখে দেখুন, একেবারে টাটকা। আজই আমার মেয়ে অনেক কষ্টে বাগান থেকে নিয়ে এসেছে।

তা শেষ পর্যন্ত আখের ছিবড়ে খেতেই হল ময়নামাসি ও পলাশপুরের শালিকদিদিকে।

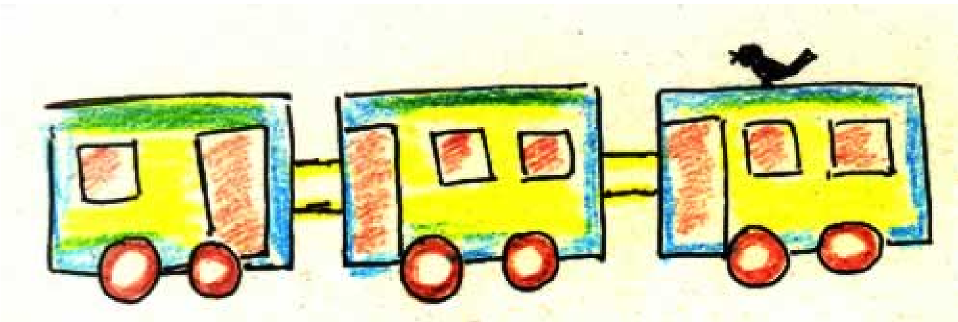

ময়নামাসি বলল, তা এবার তোমার মেয়ে দেখাও।

কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি বলল, মেয়ে এখন সাজ করছে, সাজ শেষ হলেই নিয়ে আসব। তা আপনার ছেলে কী কী করে শুনি?

-কী আর করবে, এ বছর ইয়ে পাশ করেছে। নানা কাজে ওকে কখনো পলাশপুর, কখনও শিমুলতলি কখনও হাটতলায় যেতে হয়।ঘর পৌঁছোতে পৌঁছোতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। শুনছি ও নাকি কুলতুলির নেতা হবে। খাওয়াদাওয়ার কোনই অভাব নেই আমাদের ওখানে। ডালগমের ক্ষেত আছে। কাজেই আমাদের

ঘরে সবসময়ই খাবার মজুত থাকে। পোকামাকড় বড়ো একটা খাই না। আমরা এখন উচ্চঘর কি না!

-বাঃ এ তো ভালো খবর। আমার মেয়ে তবে সুখেই থাকবে, বলল কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি।

-হ্যাঁ, হ্যাঁ সুখে থাকবে বৈ কী! শুধু ঘর দেখবে আর কাচ্চাবাচ্চা সামলাবে।কাজকর্ম বিশেষ করতে হবে না, এটুকু বলতে পারি।

-হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই বলেছে ময়নামাসি। বলল পলাশপুরের শালিকদিদি। এরপর আরো দু-তিন কথার মধ্যেই শালিকমেয়ে এসে পড়ল ওদের মাঝখানে।

ময়নামাসি বলল, তা তোমার নাম কী মা?

-টি-টি-টি, বলল শালিকমেয়ে।

-বাহ্, কী কী কাজ করতে পারো?

-আখের মাঠ থেকে আখের ছিবড়ে আনতে পারি, জলে গিয়ে নাইতে পারি, কেউ বললে গাইতে পারি।

-আর কী কী পারো মা?

- মাসির বাড়ি যেতে পারি, পিসির বাড়ি যেতে পারি, রেলগাড়ির মাথায় চড়তে পারি, একলা একলা হাঁটতে পারি।

-বাহ্, খুব ভালো, বাহ্ খুব ভালো। এবার যেতে পারো মা।- বলল ময়নামাসি।

এরপর আলাদা করে কুসুমপাড়ার ময়নাদিদিকে বলল ময়নামাসি, তা বিয়েতে কী কী দিতে পারবে শুনি? আমার ছেলে তো ইয়ে পাশ করেছে, নেতাও হবে, ওর তো কিছু চাই।

-বেশ্, সজনখালির মাঠ আমাদের নামে ছিল, ওটা তোমার ছেলের নামে করে দেব, কুসুমপাড়ার ঘাট তোমার ছেলের নামে করে দেব আর কুসুমপাড়ার ভোট তাও তোমার ছেলে পাবে, এটুকু বলতে পারি। এসব শুনে ময়নামাসির খুবই আনন্দ হল। পলাশপুরের শালিকদিদিকে বলল, ভালোই হল, এবার ছেলেকে গিয়ে সব বলতে হবে। তুমি আমার জন্য অনেক করলে বোন।

-এ এমন আর কী! বলল পলাশপুরের শালিকদিদি।

-তোমাকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে বরযাত্রী যেতে হবে। তোমার নিমন্ত্রণ রইল। যাবে তো?
নিশ্চয়ই যাব, বলল শালিকদিদি।

কুসুমপাড়ার ময়নাদিদিকে ময়নামাসি এবারে বলল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, এবারে যাই।

-আবার আসবেন, হাসিমুখে বলল কুসুমপাড়ার ময়নাদিদি।

-আচ্ছা। বলল ময়নামাসি।

বেলা গড়াল।

এরপর একজন উড়ে চলল কুলতলিতে আর একজন উড়ে চলল পলাশপুরে।

সূর্যঠাকুর তখন পশ্চিম আকাশে যাই যাই করছেন।

সুনির্মল চক্রবর্তী

প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল চক্রবর্তী তাঁর এই গল্পটি ইচ্ছামতীতে প্রকাশিত হবার অনুমতি দিয়েছেন। এই গল্পটি পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

ইলিশ

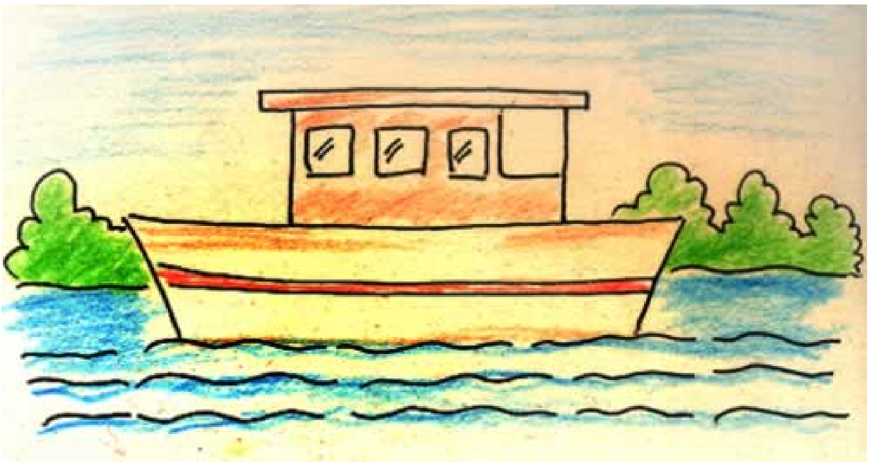

মাসির বাড়ি যাবার কথা শুনলে বুম্বা ও টুলু নাচতে থাকে তাই রথের সময় মাসির বাড়ি যাবার প্ল্যান হয়েছে শুনে তো ওরা আনন্দে আত্মহারা – বুম্বা তখনই ক্যালেন্ডার দেখে বলে দিলো আর মাত্র চার দিন। তবে চার দিনও যে কাটতে চায় না – স্কুল থেকে ফিরেই দুজনে মায়ের পেছনে ঘুরছে – কখন বেরুতে হবে, কদিন থাকবো ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নে লতিকা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। বুম্বা ও টুলুর মত লতিকা আর ওর ছোট বোন বিথীকা বছর দুয়েকের ছোট বড় আর দুই বোনে ভীষণ ভাব। প্রায় রোজই ফোনে ঘন্টা খানেক গল্প হবেই তাতেও মনে হয় স্বাদ মেটে না – তাই ছেলে মেয়েদের মত লতিকার মনেও খুসির জোয়ার। ওদের বর অতনু ও সোহম বা সমু আবার কলেজের বন্ধু – বুম্বা ও টুলু সমুকে মেসোকাকু বলেই ডাকে। সমু ও বিথীর মেয়ে ময়না বয়সে প্রায় টুলুর সমান তাই দেখা হলেই ওদের আর আলাদা করা যায় না – খাওয়া, শোয়া সবই প্রায় একই সাথে – দুজনেই আবার বুম্বাদাদার ভীষণ ভক্ত। সমু এখন সেচ বিভাগের কুলপি অফিসের বড় ইঞ্জিনিয়ার – এবার রথযাত্রার ছুটির সাথে শণি রবিবার ইত্যাদি মিলিয়ে দিন চারেকের ছুটি তাই সমু ফোন করেছিলো ওদের চলে আসার জন্য। এই সময়ের ঝির ঝিরে বৃষ্টিতে খুব ইলিশ মাছ উঠছে গঙ্গাতে আর এটা ইলিশ মাছ খাওয়ার নিমন্ত্রণ তাছাড়া অন্য প্ল্যানও আছে তবে সেটা খোলসা করে বলে নি। কুলপি ডায়মন্ড হারবার ছাড়িয়ে আরও নিচে গঙ্গার ধারে ডিষ্ট্রিক্ট টাউন আর ওখানকার সেচ বিভাগের মাথা হচ্ছে সমু অতএব দুবার ভাবার ব্যাপারই নয়। অতনুরা ভেবেছে এবার নিজেদের গাড়ি নিয়েই যাবে – ডায়মন্ড হারবারের রাস্তাটা ভালোই – ভোর ভোর বেরুলে ঘন্টা ছয়েকের মধ্যে পৌছে যাবে। যাবার আগের দিন থেকেই বুম্বা ও টুলুর ভীষণ উত্তেজনা – রাত্রে ঘুম আর আসতে চায় না – ঘন্টায় ঘন্টায় উঠে ঘড়ি দেখছে – শেষে মার ঘড়ির এলার্ম বাজার আগেই দুজনে উঠে চান টান করে একেবারে জুতো মোজা পরেই ঘর থেকে বেরিয়েছে। লতি তো হেসে অস্থির – অতনুকে ডেকে বললো,

'তোমার ছেলে মেয়েকে দ্যাখো – মাসির বাড়ি যাবার জন্য কাক ভোরে উঠে দুজনেই রেডি আর স্কুলের দিন হলে তো বিছানা থেকে টেনে তোলাই মুস্কিল। তা হলে আর দেরি কেন – বেরিয়ে পড়লেই হয় – রাস্তায় কোথাও চা টা খেয়ে নেওয়া যাবে।'

ছটার আগেই ওরা বেরিয়ে পড়লো – সুন্দর রাস্তা আর এত ভোরে প্রায় ফাঁকা। ঘন্টা খানেক পর একটা ছোট জায়গায় গাড়ি থামিয়ে মাটির ভাড়ে চা আর ল্যাড়ে বিস্কুট খাওয়া হলো। তারপর ডায়মন্ড

হারবার শহরে কচুরি ও গরম জিলিপি দিয়ে ব্রেকফাস্ট। এর মধ্যে সমুর ফোন – ন্যাসনেল হাইওয়ে থেকে ওদের বাড়ি পর্যন্ত মাইল দশেক রাস্তা বৃষ্টিতে খারাপ হয়ে খানা খন্দে ভরে আছে – ওখানটা অতনু যেন সাবধানে চালায় আর গাড়ির জানালা যেন অবশ্যই বন্ধ রাখে না হলে ট্রাক কিংবা বাস কাদা ছিটিয়ে একাকার করবে। কুলপির রাস্তায় ঢুকে গাড়িতে আর স্পিড দেওয়া যাচ্ছে না – গাড়ি, বাস, ট্রাকের সাথে গরুর গাড়ি, মোষ, ছাগল সবই চলেছে তার মধ্যে আবার ঝির ঝির বৃষ্টির শুরু। এর মধ্যে একটা ট্রাক ওদের পাশ কাটাবার সময় গাড্ডায় পড়ে ওদের ছোট্ট গাড়িকে একেবারে কাদা স্নান করিয়ে দিয়েছে – ভাগ্যিস সমুর কথা মত গাড়ির জানালা বন্ধ ছিলো। অবশেষে প্রায় একটা নাগাদ ওরা সমুদের বাড়ি পৌছালো। গাড়ির আওয়াজে প্রথমেই ময়না দৌড়ে বেড়িয়ে এসে টুলুর গলা জড়িয়ে ধরেছে – এর মধ্যে বিথী ও সমুও এসে গিয়েছে – টুলু ও ময়নার মত লতি বিথীও পারলে গলা জড়িয়ে নাচ শুরু করে। বেচারি বুম্বা গম্ভীর মুখে গাড়ির ডিকি থেকে সুটকেস দুটো বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সমু তাড়াতাড়ি বুম্বাকে হাত ধরে নিয়ে এসে বিথীকে বললো,

'তোমরা কিন্তু এ বেচারিকে পাত্তাই দিচ্ছো না – এটা অন্যায়।'

বিথী দিদিকে ছেড়ে এসে বুম্বাকে জড়িয়ে ধরলো,

'আমার বুম্বা দাদার রাগ হয়েছে বুঝি – এবার মাছি তোকে আর ছাড়বে না। চলো, চলো সবাই ভেতরে চলো তো – এই ঝির ঝিরে বৃষ্টিতে আর ভিজতে হবে না। এই দুই মেয়ে – তোরা কি বাইরেই নাচবি না ভেতরে আসবি?'

সমু হাসলো,

'আয়, আয় সবাই ভেতরে আয় – বাচ্চাদের তো ক্ষিদে পেয়ে গিয়েছে – তাই না রে বুম্বা। তোদের জন্য স্পেশাল অর্ডারে আজ সকালে এখানকার মাছের সব থেকে বড় আড়তদার ইয়াসিন মল্লিক একটা আড়াই কিলোর ইলিশ দিয়ে গিয়েছে – এই চওড়া পেটি – এ রকম বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা দারুণ জমবে। কি রে বুম্বা, ইলিশ মাছ তো তোর ভীষণ প্রিয় – তোর জন্য সব থেকে বড় পেটি গুলো মাসি রেখেছে।'

হাত মুখ ধুয়ে সবাই খাবার টেবিলে – বিথী টেবিল গুছিয়েই রেখেছিলো – ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ি থালায় সাজিয়ে দিলো সেই সাথে ইলিশ মাছ ভাজা – যত ইচ্ছে।

'এ্যাই দিদি, তোর আর আমার কিন্তু প্রথমে সাদা ভাত – ইলিশ মাছ ভাজার তেলটা আলাদা করে রেখেছি আর মুড়োটা একেবারে কুড়কুড়ে ভাজা।'

'অপূর্ব, এই না হলে আমার বোন – কত দিন ইলিশ মাছ ভাজার তেল দিয়ে ভাত খাইনি রে আর তার সাথে কুড়কুড়ে মুড়ো ভাজা – আহাঃ।'

অতনু একটু চিমটি কাটলো,

'লতি একটু সামলে – না হলে জিভের জলে যে টেবিল ভেসে যাবে।'

টুনু ও ময়নার মাছ বেছে দিতে দিতে বিথী বললো,

‘আর বদমাইসি না করে খাওয়াতে মন দাও তো তনুদা – সব ঠান্ডা হয়ে গেলো। দেখ তো বুম্বা কেমন লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে যাচ্ছে।’

খেতে খেতে সমু ওর অন্য প্ল্যানটা বললো – কাল সকালে ওরা লঞ্চে করে সুন্দরবন বেড়াতে যাবে। সব ঠিক হয়ে গিয়েছে – লঞ্চে রান্না, খাওয়া, শোওয়া সব কিছুর ব্যবস্থা আছে। কপাল ভালো হলে সুন্দরবনের মহারাজের সাথেও দেখা হতে পারে। বড় মাঝি কাদের মিঞা আরো দুজন বিশ্বাসী মাঝিকে সঙ্গে নেবে। বুম্বা ও টুলু খাওয়া বন্ধ করে হাঁ হয়ে সমুর কথা শুনছিলো – টুলু জিজ্ঞেস করলো,

‘মেসোকাকু, মহারাজটা কে?’

বুম্বা গম্ভীর মুখে উত্তর দিলো,

‘এটাও জানিস না? সুন্দরবনের মহারাজ হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার – চিড়িয়াখানায় দেখিস নি? মনে নেই ওটা ডাকতে তোর কি হয়েছিলো – বলবো?’

‘এই দাদা, একদম না – তাহলে কাট্টি হয়ে যাবে কিন্তু।’

ওদের খাওয়া শেষ হতে না হতেই কাদের মিঞা এসে খবর দিয়ে গেলো লঞ্চ রেডি আছে – চাল, ডাল, তরি তরকারির সাথে দুটো মুরগি ও ডিজেল তুলে নিয়েছে। কাল সকালে জোয়ারের পরে সকাল আটটা নাগাদ রোওয়ানা হবে। ভর দুপুরে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে ভূরিওভোজের পর সবারই ঢুলুনি এসে গিয়েছে – সমু ও অতনু তো সোজা বিছানাতে। বাচ্চারাও একটু সময় এদিক ওদিক করে আর জেগে থাকতে পারলো না তবে লতি ও বিথী বিছানাতে শুয়ে শুয়ে নিজেদের গল্পে মেতে রইলো।

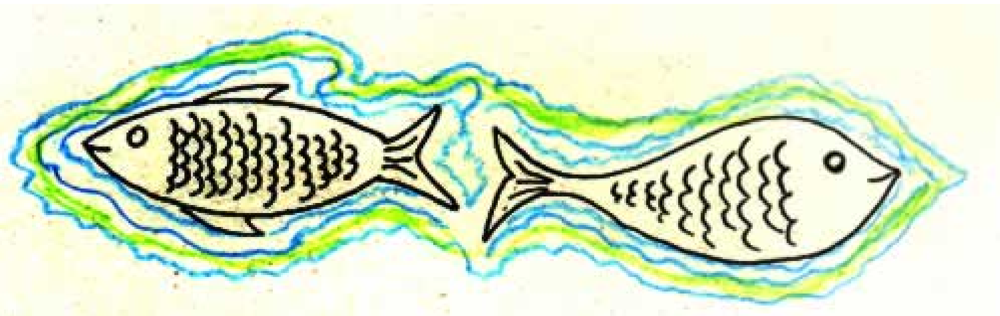

পর দিন সকালে পাওরুটি মাখন আর ডিম সেদ্ধ খেয়ে সবাই বেরিয়ে পড়লো গঙ্গার ঘাটের দিকে। নৌকা দেখে বুম্বা অবাক – কত বড় তার মধ্যে আবার ঘরও আছে – ওপরে রেলিং দেওয়া ছাত তাতে আবার চেয়ার টেবিল পাতা। গঙ্গাতে স্রোত বেশ – নদী কি বিরাট চওড়া এখানে – ওপাড় প্রায় দেখাই যায় না। স্রোতে নৌকা বেশ দুলছে – কাদের মিঞা ওদের হাত ধরে কাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে নৌকাতে নিয়ে এলো। লতির বেশ ভয় ভয় করছিলো – এই প্রথম নৌকাতে চড়েছে তার ওপর কি স্রোত রে বাবা – বার বার বাচ্চাদের সাবধান করছিলো,

‘তোরা একদম রেলিং এর পাশে যাবি না কিন্তু।’

কাদের মিঞা হেসে বলল,

‘ভয় পাইয়েন না মা ঠাকরান – আমরা আছি – কিছু হইবো না।’

জিনিষ পত্র নিচে রেখে সবাই ছাতে গিয়ে বসতে কাদের মিঞা বদর বদর বলে নৌকার গলুইতে নদীর জল ছিটিয়ে হাল ধরলো আর এক জন মাঝি নৌকার কাছি খুলে দিতেই স্রোতের টানে নৌকা পাড় থেকে খানিকটা দূরে এসে কাদের মিঞার হালের কেরামতিতে হেলতে দুলতে এগিয়ে চললো। গঙ্গার জল বেশ ঘোলা আর ঢেউ গুলো ছলাৎ ছলাৎ শব্দে পাড়ে এসে ধাক্কা দিচ্ছে – মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে তাই গরম একেবারেই নেই। আকাশে নানা রঙ্গের মেঘে ভেসে চলেছে – কোনটা ধূসর, কোনটা কালচে আর ওদের মাঝে সাদা মেঘেরাও মিলে মিশে চলেছে ঘাড়ে ঘাড় মিলিয়ে তবে বাঁচোয়া যে বৃষ্টি নেই। নদীর পাড়ে গাছ পালার ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝেই দেখা যায় ছোট ছোট গ্রাম – মাটি কেটে নারকেল গাছ ফেলে তৈরি হয়েছে নদীর ঘাট – মাছ ধরার নৌকা গুলো ঘাটের কাছেই বাঁধা আর তার আশে পাশে বেশ কিছু লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাছ ধরার জাল গুলোকে কয়েক জন পরিষ্কার করছে নদীর ধারে। কাদের মিঞা বললো, ভোর বেলা মাছ ধরে জেলেরা ফিরেছে এখন পাইকারি ক্রেতারা দাম দর করছে মাছ কেনার জন্য। নদীতে কত ছোট বড় নৌকা চলেছে – নদীর মাঝখান দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে স্টিমার চলেছে বেশ কয়েকটা। একটু পর দূর থেকে একটা মস্ত বড় জাহাজ আসতে দেখা গেলো – ওটাকে সম্ভ্রম দেখিয়েই বোধ হয় সব কটা নৌকা, স্টিমার সরে গেলো নদীর মাঝখান থেকে। জাহাজটা কাছে আসতেই আসল কারণটা বোঝা গেলো - জাহাজের পেছনের টার্বাইন ব্লেডের ধাক্কায় সাদা ফেনা ছড়িয়ে বেশ বড় বড় ঢেউ উঠে দুদিকে ছড়িয়ে পড়ছে আর তার ধাক্কায় ছোট ছোট নৌকা গুলো বেশ জোরেই দুলে উঠলো এমন কি একটু পরেই ওদের নৌকাকে দুলিয়ে ঢেউ গুলো পাড়ে আছড়ে পড়লো। কাদের মঞা বললো,

'বিদেশের জাহাজ – অনেক মাল নিয়া চলছে ডায়মন্ড হারবার। আপনাগোর কোলকাতায় এত বড় জাহাজ যাইতে পারে না নদীর পলির জন্য।'

চারদিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে কি করে সময় কেটে যাচ্ছে বোঝাই গেলো না – এমন কি লতি বিথীও গল্প করা ভুলে গিয়েছে। দুপুরের খাবার আসতে বোঝা গেলো প্রায় একটা বাজে – একটু লালচে চালের ভাত, ঝুর ঝুরে মৌরালা মাছ ভাজা, পেঁয়াজ দিয়ে মশুর ডাল আর শুকনো শুকনো করে রান্না মুরগির মাংস। কাদের মিঞা বললো,

'সকালে মৌরালা মাছ পাইয়া গেলাম – দ্যাখেন মা ঠাকরানরা খালেদ ভাই কেমন রান্না করলো। পোলাপানের জন্য মরিচ একেবারেই দেয় নাই।'

এই অপূর্ব পরিবেশে খাওয়াটাও অপূর্ব লাগছে – গঙ্গার বুকে চলতে চলতে এই খাওয়া ভাবাই যায় না। বহুদিন পর লতিরা এই রকম মৌরালা মাছ ভাজা খেলো আর মুরগি রান্না তো যে কোন বড় হোটেলের সাথেই পাল্লা দিতে পারে। সমু আস্তে করে লতিকে বললো,

'এই জন্যই কাদের মিঞাকে নেওয়া – ও ঠিক বুঝতে পারে আমাদের জিভ।'

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই বিশ্রাম করতে গেলেও বুম্বা ছাত থেকে নামলো না – ওখানে বসে বসেই কাদের মিঞার সাথে কত গল্প আর ওর হাজারো প্রশ্নের উত্তর কাদের মিঞা হাসি মুখে দিয়ে গেলো। ওরা এখন সুন্দরবনের দিকে চলেছে – নৌকা গঙ্গা থেকে সরে একটা খাড়ির মধ্যে চলে এসেছে। আস্তে আস্তে দুই পাড়ের চেহারাও পালটে যাচ্ছে বাঁ পাড়ে ধান ক্ষেত, গ্রাম দেখা গেলেও ডান দিকে জঙ্গল। কাদের মিঞা জানালো, এখানকার জলে বেশ বড় বড় কুমির আছে তবে তা থেকেও ভয়ের হলো

কামট বা ছোট হাঙ্গর – নদীর ঘাটে সাবধানে দেখে শুনে জলে না নামলে টের পাবার আগেই হাত বা পা কেটে নিয়ে যাবে। বুম্বা অবাক হয়ে ভাবছিলো কাদের মিঞা কি করে নদীর রাস্তা মনে রেখেছে – এক খাড়ি থেকে আর এক খাড়িতে এঁকে বেঁকে চলেছে – বুম্বার কাছে সবই তো সমান মনে হচ্ছে। অবশ্য ডান দিকের জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে এসেছে – এদিকের খাড়িতে বিশেষ নৌকা দেখা যাচ্ছে না। ভাটার জন্য নদীর ধারে বিশেষ করে ডান দিকে ভীষণ কাদা আর তার মধ্যে লাঠির মত কি সব দাঁড়িয়ে আছে – শুধু পাড়েই নয় ওই ডান্ডা গুলো জঙ্গলের ভেতর দিকেও ছড়িয়ে আছে। কাদের মিঞা বললো এগুলো সুন্দরী গাছের শেকড় – জোয়ারের সময় অনেকটা জঙ্গলও নোনা জলে ডুবে যায় তাই শেকড় গুলো খাড়া ওপর দিকে দু তিন ফুট ওঠে আলো হাওয়ার জন্য। এখানকার সব গাছ পালা নোনা জলেই বেঁচে থাকে – এটাই সুন্দরবনের বিশেষত্ব। এর মধ্যে নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে অন্য মাঝি বসির আলি একটা ছোট জাল বের করে নৌকার পেছন থেকে ঘুরিয়ে ছুঁড়তে ওটা খোলা ছাতার মত গিয়ে জলে পড়লো। বুম্বা তাড়াতাড়ি নৌকার পেছনে এসে দেখে বসির ধীরে ধীরে জালটাকে টেনে তুলছে আর তার মধ্যে বেশ কিছু ছোট বড় মাছ লাফাচ্ছে। এর মধ্যে খালেদ ভাইও এসে গিয়েছে – ওরা কিছু মাঝারি সাইজের মাছ বেছে নিয়ে বাকিদের জলে ছেড়ে দিলো।

দুপুরের দিবা নিদ্রার শেষে বিথী নৌকার ছাতে এসে অবাক হলো,

'কি রে বুম্বা, তুই সারা দুপুর এখানেই বসে ছিলি?'

'মাসি, কাদের মিঞার কাছে কত কিছু শিখলাম – জানো, আমরা এখন সুন্দর বনে চলে এসেছি – ওই যে কাদা আর জঙ্গলের মধ্যে লাঠি গুলো দেখছো ওগুলো কিন্তু সুন্দরী গাছের শেকড় – এখানের সব গাছপালা নোনা জলেই হয়।'

হঠাৎ কাদের মিঞা নৌকার ইঞ্জিন বন্ধ করে বললো,

'দ্যাখেন, দ্যাখেন, এক দল হরিণ আইসে পানি খাইতে।'

সবার নজর ওই দিকে – গোটা দশ বারো হরিণ সজাগ চোখে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে কাদা পেরিয়ে নদীর ধারে জল খেতে এসেছে। কি সুন্দর রং – সারা গায়ে হলুদ রঙের মধ্যে কালো বুটি বুটি আর এই বড় বড় টানা টানা চোখ – কয়েকটার আবার বড় বড় শিং আছে – চোখ ফেরানো যাচ্ছে না এত অপূর্ব দেখতে। জল খেতে খেতে ওরা মাঝে মাঝেই মুখ তুলে চার দিক দেখে নিচ্ছে – হঠাৎই একটা বড় শিংওয়ালা হরিণ ছট ফট করে কেমন একটা অদ্ভুত স্বরে ডেকে উঠতেই সব কটা হরিণ জল খাওয়া ছেড়ে লম্বা লম্বা লাফে কাদা পেরিয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেলো। নৌকার পেছন থেকে খালেদ ভাই বললো,

'ও কাদের মিঞা, কুমির আইসে – নৌকার ডাইনে দ্যাখেন।'

সবাই তাকিয়ে দেখে একটা বড় কুমির পাড়ের কাদার গা ঘেঁসে জলে ভাসছে আর ওটাকে দেখতে পেয়েই হরিণদের সর্দার ওই ভাবে ডেকে উঠেছিলো। লতি ও বিথী শিউরে উঠলো,

'চিড়িয়াখানায় দেখা আর এখানে দেখার মধ্যে কত তফাৎ।'

কাদের মিঞা ধীরে ধীরে বললো,

‘এত গুলান হরিণ এই খানে – মহারাজ কাছেই হইবেন – কি কও খালেদ ভাই?’

‘মনে তাই হয় মিঞা। এই সময়টা তো ওনার খুব প্রিয় – সব জন্তু জানোয়ার গুলান নদীতে পানি খাইতে আসে।’

সমু জিজ্ঞেস করলো,

‘কি কাদের মিঞা, মহারাজ দর্শন দেবেন নাকি?’

‘দেখা যাউক। ও খালেদ ভাই তুমি আর বসির আলি একটুকান বৈঠা টানো দেখি। মহারাজ বৈঠার আওয়াজটা পছন্দ করেন বলিয়াই তো জানি।’

বুম্বা অবাক হলো,

‘বৈঠার আওয়াজ কেন মেসোকাকু?’

‘বৈঠার আওয়াজ শুনে বাঘ বুঝতে পারে নৌকা চলেছে – শুনেছি নদী সাঁতরে এসে ছোট নৌকার ওপর অনেক সময় হামলা করে লোক তুলে নিয়ে গিয়েছে।’

লতি হয়ে কেঁপে উঠলো,

‘এই সমুদা, আমাদের নৌকায় হামলা করবে না তো? কাদের মিঞা তো বৈঠার আওয়াজে নিমন্ত্রণ করছে। তুমি বলো ইঞ্জিন চালিয়ে তাড়া তাড়ি এখান থেকে সরে যেতে। দরকার নেই মহারাজার দর্শনের।’

কাদের মিঞা হাসলো,

‘ভয় পাইয়েন না মা ঠাকরান – আমাগো বড় নৌকা – এই খানে উনি উঠতে পারবেন না। আর আমরা তো মাঝ নদীতে।’

হঠাৎই দূর থেকে একটা গম্ভীর আওয়াজ ভেসে এলো। কাদের মিঞা বললো,

‘ওই শুনেন উনার হাঁক – মনে লয় অন্য দিকে চইলা গ্যাছেন শিকারে।’
বুম্বা টুলুর দিকে তাকালো,

‘কি রে টুলু, শুনলি তো মহারাজের হাঁক – তোর কিছু হয় নি তো?’

‘দাদা, আমি বড় হয়েছি – উলটো পালটা কথা বলবি না একদম।’

ধীরে ধীরে গোধূলির আলোতে জঙ্গলে আলো থেকে ছায়ার খেলা বেড়ে গেলো। হাজার হাজার নাম না জানা পাখীর ঘরে ফেরার আওয়াজে চারদিক ভরে গিয়েছে – গাছের ওপর ওদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ আসছে। কাদের মিঞা জানালো আর একটু এগিয়ে খাড়িটা যেখানে অনেকটা চওড়া হয়েছে ওখানেই নদীর মাঝখানে আজ রাতের জন্য নৌকার নঙ্গর ফেলবে – অন্ধকারে নৌকা চালানো ঠিক হবে না। গোধূলির আলোর পর অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি নেমে এলো। বসির আলি গোটা তিনেক প্যাট্রমাক্স জ্বালিয়ে ছাতে, ঘরে আর নৌকার সামনে রাখলো আর সেই আঁধো ভূতুরে আলোতে কাদের

মিঞা নৌকা এগিয়ে নিয়ে গেলো যেখানটায় খাড়িটা অনেকটা চওড়া আর নদীর বাঁ দিকে একটা গ্রামও দেখা যাচ্ছে – গ্রামের আলোগুলো জোনাকি পোকার মত চিক চিক করছে। সমু আস্তে করে বললো, 'সুন্দরবনের আরও ভেতরে বোম্বেটেদের আনাগোনা আছে আর চোরা চালানকারীদেরও ফলাও ব্যবসা বাংলা দেশের সাথে। তবে এদিকে এখনও শোনা যায় নি।'

বিথী ঝাঁঝিয়ে উঠলো,

'কি দরকার ছিলো রাত্রে নদীতে থাকার। তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি – এখন ভালোয় ভালোয় কালকে বাড়ি ফিরে যেতে পারলে বাঁচি।'

কাদের মিঞা ভরসা দিলো,

'ভয়ের কিছু নাই – ডাকাইতরা এই দিকে আসে না। বাংলা দেশেই বেশী জ্বালায়।'

রাত্রের খাওয়াটাও জমিয়ে হয়েছে – সরষে ইলিশ আর পার্শে মাছের ঝোল। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই মিলে ছাতে বসেই গল্প চললো। ডান দিকের জঙ্গল থেকে নানা রকম রাত জাগা পাখীর আওয়াজ আসছে – এই আঁধো অন্ধকারে কেমন যেন গা ছম ছম করা ভাব। পেট্রোমাক্সের আলো চার পাশের অন্ধকারকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রামের আলো গুলো এক এক করে নিভতে শুরু করেছে – চারদিকে কেমন যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। দূরে কোথাও হরিণের ডাক শোনা গেলো তারপরই আবার সেই হুঙ্কার। লতি ভয়ে কেঁপে উঠলো,

'আর নয় – ছাতে বসে এমনিতেই গা ছমছম করছে তার মধ্যে আবার মহারাজের ডাক – চলো সবাই নিচে শুতে – আমার এখানে ভয় করছে।'

সবাই শুয়ে পড়লেও বুম্বার আর ঘুম আসে না – অনেক ক্ষণ এদিক ওদিক করে চুপি চুপি দরজা খুলে এসে ছাতের সিঁড়িতে বসলো। এখন একটা মাত্র পেট্রোমাক্স জ্বলছে তাও আলোটা খুব কমানো ফলে বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার – নদীর দুই পাড়ে জোনাকি পোকারা জ্বলছ নিভছে। মাঝে মাঝে অন্য কোন জন্তু জানোয়ার বোধ হয় নদীতে জল খেতে আসছে – ওদের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠছে। মাঝিরাও ঘুমিয়ে পড়েছে। বুম্বার কিন্তু একেবারেই ভয় করছে না – আপন মনে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে আরো কিছু দেখা যায় কিনা তার চেষ্টাই করে চললো। হঠাৎ মনে হলো ডান দিকে নদীর ধারে দুটো বড় বড় চোখ জ্বল জ্বল করেই আবার হারিয়ে গেলো – একটু পরেই আবার ফিরে এলো। বুম্বা শক্ত হয়ে বসে ওই দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে – এখন আর অন্ধকারে দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না। কিছু সময় নদীর ধারে নানা জায়গায় ওই চোখ জোড়া দেখা গেলো যেন কোন জন্তু নদীর ধারে পায়চারি করছে। একটু পরেই ছপ ছপ শব্দ করে কেউ যেন জলে নামলো তারপরই ওই জ্বলজ্বলে চোখ দুটো জলে ভেসে ভেসে এগিয়ে এলো। বুম্বার মনে ঝড়ের বেগে অনেক গুলো চিন্তা এসে গিয়েছে – ওই চোখ দুটো তো মহারাজ ছাড়া আর কারো হতেই পারে না – ওটা কি নৌকার দিকেই আসছে? ও কি করবে? মাঝিদের ডাকবে? তারপর ভাবলো দেখাই যাক না মহারাজ কি করেন – হয়তো বা সাঁতরে ওপাশের গ্রামের দিকে চলেছেন গরু ছাগলের খোঁজে – তাছাড়া কাদের মিঞা বলেছে ওদের নৌকা অনেক উঁচু। আস্তে করে সিঁড়ি থেকে নেমে বুম্বা নৌকার গলুইএর দিকে এগিয়ে গেলো – ওখানে বসির ভাই ঘুমাচ্ছে। দেখে ধীরে ধীরে ওই ভাটার মত জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর

সাথে মস্ত বড় মাথা গলুইএর কাছে এসে গিয়েছে – কিন্তু ওখানটা তো জল থেকে প্রায় পাঁচ ফুট ওপরে

– তাহলে? গলুইএর পাশে রাখা বৈঠাটাকে দু হাতে শক্ত করে ধরে বুম্বা রেডি হয়ে বসলো – হঠাৎ বাঘটা অদ্ভুত কায়দায় জল থেকে লাফিয়ে উঠে নৌকার ধারটা ধরে ফেলেছে আর ওর ওজনে নৌকা সামনের দিকে আরো নিচু হয়ে গিয়েছে – বুম্বার থেকে মাত্র ফুট পাঁচেক দূরে। এই বড় মাথা, থাবার নখ গুলো ইঞ্চি তিনেক করে বেরিয়ে এসেছে – ভাটার মত চোখ দুটো একবার বুম্বাকে দেখছে আর একবার ঘুমন্ত বসির ভাইকে। বুম্বা প্রাণের ভয়ে 'বসির ভাই - বাঘ' বলে প্রচন্ড চিৎকার করে গায়ের সমস্ত জোরে বৈঠাটাকে তুলে বাঘটার নাকের ওপর মারলো

\- -

'এ্যাই বুম্বা, ভোর সন্ধ্যে বেলা ঘুমের মধ্যে এমন গাঁক গাঁক করে চেঁচাচ্ছিস কেন।'

বলে বিথী দৌড়ে এসেছে – পেছন পেছন লতিও হাজির। বুম্বা উঠে বসেছে – সমস্ত গা ঘামে ভেজা। লতিই বললো,

'ঠিক উলটো পালটা স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছে। হবে না? ভর পেট খিচুড়ির সাথে ওতো গুলো ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে দুপুরে ঘুমিয়েছে – পেট গরম তো হবেই।'

অঞ্জন নাথ
ব্যাঙ্গালোর, কর্নাটক

বিদেশী রূপকথা: ছয় রাজহাঁসের গল্প

অনেকদিন আগে ছিল এক রাজা। একবার ঘোড়ায় চেপে শিকার করতে করতে মাঠ পেরিয়ে বন পেরিয়ে গাছগাছালির ছায়া পেরিয়ে রাজা চলে গেল অনেক দূর, এতদূর যে রাজার খেয়ালই নেই কখন তিনি তার সাথে তার যে সব রাজভৃত্যরা শিকারে এসেছিল তাদের থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছেন। সন্ধ্যে নামতেই রাজার খেয়াল হল আসলে গভীর জঙ্গলে তিনি পথ হারিয়ে ফেলেছেন শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে। তিনি জোরে জোরে চেঁচাতে লাগলেন তার ভৃত্যদের উদ্দেশ্যে কিন্তু কারুরই সাড়া পাওয়া গেলনা। এমন সময়ই সামনে থেকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে এক বয়স্ক মহিলাকে আসতে দেখলেন রাজা, সে আসলে ছিল ডাইনী। ডাইনীকে দেখেই রাজা জিজ্ঞেস করলো সে তাকে বন থেকে বেরোবার পথ দেখাতে পারবে কিনা। ডাইনী তো মাথা নেড়েই চলেছে, মাথা নাড়তে নাড়তেই সে রাজাকে বলল, বন থেকে বেরোতে সে সাহায্য করতে পারে কিন্তু তার একটা শর্ত আছে, আর রাজা যদি সেই শর্ত পূরন করতে না পারে তাহলে সারাজীবন এই গভীর বন থেকে তিনি বেরোতে পারবেন না আর খিদে তেষ্টায় এখানেই মারা যাবেন।

কি শর্ত? রাজা ডাইনীকে জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়তে নাড়তে ডাইনী বলল, আমার এক সুন্দর মেয়ে আছে, সে অপরূপ সুন্দরী আর তোমার সঙ্গী হিসেবেই তাকে মানাবে। যদি তুমি তাকে বিয়ে করে তোমার রানি করে নিয়ে যাও তবেই আমি এই বন থেকে বেরোবার পথ তোমাকে দেখিয়ে দেব। ডাইনীর মেয়েকে রানী বানাবার প্রস্তাব মন থেকে মেনে নিতে না পারলেও খানিকটা ভয়ে ভয়েই আর ওই গভীর জঙ্গলের থেকে বেরোবার কোন উপায় না পেয়ে রাজা তার সম্মতি দিলেন ডাইনীকে। ডাইনী রাজাকে নিয়ে বনের ভেতর তার ছোট্ট ঘরে নিয়ে এল, যেখানে তার মেয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঘর গরম করছিল। ডাইনীর মেয়ে যেন রাজার জন্যই অপেক্ষা করছিল, রাজা আসতেই তাকে সাদরে ঘরের ভেতর নিয়ে এসে তার সেবাযত্ন করল ডাইনীর মেয়ে। রাজা তার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে সে সত্যিই অপরুপ সুন্দরী, কিন্তু তবুও রাজার মন থেকে ডাইনীর যাদুবিদ্যার ভয় কিছুতেই যেন কাটছিল না, কোন এক গোপন ভয়ের কথা চিন্তা করতে করতে তার বুক কেঁপে উঠছিল। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাজা ডাইনীর মেয়েকে নিয়ে ঘোড়ায়

উঠলো, আর ডাইনীও তাকে বন থেকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিল। নিজের রাজ্যে ফিরে এসে ডাইনীর শর্ত অনুযায়ী রাজার সাথে ডাইনীর মেয়ের ধূমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল।

এদিকে হয়েছে আর এক বিপদ। রাজার প্রথম পক্ষের বউ এর ছয় ছেলে আর এক মেয়ে ছিল, আর প্রথম বউএর মৃত্যুর পর থেকেই রাজা তাদের নিজের প্রানের চেয়েও বেশি ভালোবাসত ; এতটাই ভালোবাসত যে ডাইনীর মেয়েকে বিয়ে করে আনার পর থেকেই রাজার মনে এক দুশ্চিন্তা সবসময় কাজ করতে লাগল যে, হয়ত তাদের সৎমা তাদের অনিষ্ট করবে, তাদের ওপর অত্যাচার করবে; আর এই সব ভেবেই রাজা তার সাত ছেলে মেয়েকে বনের গভীরে লোকচক্ষুর আড়ালে এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে রেখে দিয়ে এলেন। সে দুর্গ এমনই দুর্গম যে তিনি নিজেও তার পথ ভুলে যেতেন। একজন ভালো জাদুকর তাকে একটা জাদুবল দিয়েছিল সেই দুর্গের পথ মনে রাখার জন্য। যখনই রাজার তার সাত ছেলেমেয়েকে দেখতে যাওয়ার জন্য দুর্গে যেতে ইচ্ছে করত তখনই ওই জাদুবল কে তিনি তার সামনে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিতেন আর সেই বল তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত বনের ভেতর লুকিয়ে রাখা দুর্গের কাছে।

নতুন রানী, মানে ডাইনীর মেয়েও যে রাজার এই বারবার একা বনে চলে যাওয়াটা খেয়াল করেনি তা কিন্তু নয়। আর যথারীতি এ ব্যাপারে তার জানার ইচ্ছেটাও বেড়ে গেছে দিন দিন। রাজার প্রিয় চাকর বাকরদের প্রচুর টাকার লোভ দেখিয়ে রাজা যে সেই দুর্গে যায় তার ছেলেমেয়েদের দেখতে আর সেই দুর্গে যাওয়ার রাস্তা জানার একটাই উপায় ওই জাদু বল- সে সব সম্পর্কেই ডাইনীর মেয়ে ইতিমধ্যেই খবরও নিয়ে নিয়েছে। ডাইনীর মেয়ে তার মায়ের কাছ থেকে কিছু কিছু যাদুবিদ্যা শিখেছিল আর তা দিয়েই সে বানিয়ে ফেললো একটা সাদা রঙের যাদু কাপড়ের টুকরো যার মধ্যে জাদুমন্ত্র দিলেই সে রাজার রুপ ধারন করতে পারত।তারপর একদিন রাজা বনে শিকারে গেলে সেই সুযোগে সে ওই সাদা কাপড়ের টুকরো গায়ে জড়িয়ে ঘোড়ায় করে চলল সেই গোপন দুর্গের দিকে; ইতিমধ্যেই রাজা কোথায় সে জাদুবল রেখে যায় তার হদিশ সে পেয়ে গেছিল তাই বল গড়িয়ে দিতেই বনের ভেতর দিয়ে গোপন দুর্গের দিকে সেই বল ডাইনীর মেয়েকে নিয়ে চলল।

দূর থেকে ঘোড়ায় করে তাদের বাবারই মত কাউকে আসতে দেখে রাজার ছয় ছেলে আনন্দে দৌড়তে দৌড়তে দুর্গ দিয়ে বেরিয়ে এল; বেরিয়ে আসতেই ডাইনীর মেয়ে তাদের ওপর জাদু কাপড় ছুঁড়ে দিতেই তারা ছয় ভাই ছখানা রাজহাঁস হয়ে বনের ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। ডাইনীর মেয়েও খুব আনন্দে রাজবাড়ীতে ফিরে এল; তার মনে এখন খুব আনন্দ এই ভেবে যে তার সৎ ছেলেমেয়েরা আর কেউ নেই তাকে বিরক্ত করার জন্য। কিন্তু রানী জানতও না যে রাজার সাত ছেলে মেয়ের মধ্যে ছয় ছেলে দৌড়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু তাদের ছোট বোন তখনও দুর্গের মধ্যেই ছিল; রাজার আগের পক্ষের সব ছেলে মেয়েদের রাজহাঁস বানিয়ে উড়িয়ে এসেছে ভেবে রানী মনে মনে খুব খুশী হতে লাগল।

পরেরদিন রাজা সেই বনের ভেতর দিয়ে দুর্গে এসে পৌঁছোলেন তার ছেলেমেয়েরা কেমন আছে দেখার জন্য। এসেই তো রাজা হতবাক! তার সাত ছেলে মেয়ের মধ্যে শুধু ছোট মেয়ে রয়েছে দুর্গের মধ্যে। ছোট মেয়েকে জিজ্ঞেস করায় সে তার বাবাকে সবিস্তারে জানাল তার ভাইয়েরা কেমন করে রাজহাঁস হয়ে উড়ে গেছে গভীর বনের দিকে; জানলা দিয়ে সে দেখেছে তার ভাইদের রাজহাঁস হয়ে উড়ে যাওয়া; এমনকি রাজহাঁস হয়ে উড়ে যাওয়ার আগে তাদের ডানা থেকে খসে যাওয়া পালকও সে কুড়িয়ে রেখেছে

রাজাকে দেখাবে বলে।

পালক হাতে নিয়েই রাজা পুরো ঘটনার সত্যতা বুঝতে পেরে হতাশ হয়ে দুর্গের সামনের চাতালে বসে পড়লেন আর ভাবতে লাগলেন তার একমাত্র মেয়ের কথা। রাজার চিন্তায় তখনও আসেনি যে রানীই তার ছয় ছেলেকে রাজহাঁস বানিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন। তার মাথায় তখন একটাই চিন্তা, তার একমাত্র মেয়েকে বাঁচানোর।তিনি ভাবতে লাগলেন যে এই দুর্গ আর কোনমতেই সুরক্ষিত নয় তার মেয়ের পক্ষে আর দুর্গ থেকে তিনি তার একমাত্র মেয়েকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু, পরক্ষনেই মনে হতে লাগল যদি সৎমা তার মেয়েকে ভালো মনে মেনে না নিতে পারে তবে কি হবে! এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই রাজা ঠিক করলেন তার মেয়েকে আর এক রাত্রির জন্য এই দুর্গে রাখবেন তারপর কালকের মধ্যেই কিছু না কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেবেন মেয়েকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার। এসব ভেবে তার মেয়েকে সে রাতের মত দুর্গে রেখে রাজা ফিরে এলেন একরাশ চিন্তা মাথায় নিয়ে।

এদিকে, রাত হলে দুর্গের মধ্যে একা থাকতে থাকতে ছোট মেয়েটার ভীষন ভয় করতে লাগল। তার মনে হতে লাগল ভাইদের ছাড়া সে থাকতে পারবে না এক মূর্হুতও, আর যেমনি ভাবা তেমনি কাজ, সে রাতেই সে একছুট্টে বনের দিকে বেরিয়ে গেল যেদিকে তার ভাইয়েরা রাজহাঁস হয়ে উড়ে গেছে। সারা রাত ধরে এতটুকু না থেমে ছোট মেয়েটা হাঁটতে থাকল বন পেরিয়ে বড় বড় গাছ পেরিয়ে, এমনকি তার পরেরদিন সারা সকাল ধরেও সে হাঁটতে লাগল বনের ভেতর দিয়ে, যতক্ষন না সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সন্ধ্যে নামার খানিক আগেই বনের ভেতর সে একটা পোড়ো বাড়ি দেখতে পেল। চুপিসারে বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই তার চোখে পড়ল ঘরের ভেতর ছটা ছোট ছোট খাট পাতা। এতখানি পথ পেরিয়ে এসে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল রাজার ছোট মেয়ে যে সে ঐ খাটের ওপরই রাতটা কাটিয়ে দেবার কথা ভাবল কিন্তু কিছুতেই সে খাটের ওপর উঠতে পারল না। শেষমেশ খাটের তলাতেই সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল; সন্ধ্যে নামার একটু আগেই ডানার ঝটপট শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার; চোখ খুলতেই সে দেখল ছটা রাজহাঁস কোথা থেকে উড়ে এসে জানলার ধারে বসে একে অন্যের ডানার পালক খুঁটে দিচ্ছে, আর কিচ্ছুক্ষন পরেই তাদের সব ডানা খুলে পড়ে যেতেই ছোট মেয়ে অবাক হয়ে গেল রাজহাঁসের জায়গায় তার ছয় ভাইকে দেখে; ররাজার মেয়ে তো তখন যারপরনাই খুশী তার হারিয়ে যাওয়া ভাইয়েদের পেয়ে; ভাইয়েরাও তাদের একমাত্র বোনকে দেখতে পেয়ে ভীষন খুশী কিন্তু পরক্ষনেই তাদের মন দুঃখে ভরে গেল। তাদের একমাত্র বোনের কথা ভেবে চোখ জলে ভরে এল; তারা তাদের বোন কে বোঝালো যে এই পোড়ো বাড়িটা আসলে একটা ডাকাতদের আড্ডা আর তাই রাত হলেই ডাকাতরা সব চলে এলে তাদের ছোট বোন কে দেখলেই তারা তাকে মেরে দেবে। বোন তো ছোট, সে কি এত বোঝে! সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না যখন তার ছ ছটা ভাই তার সাথেই রয়েছে তাহলে ডাকাতদের ভয় পাওয়ার কি আছে! আসলে তাদের সৎমা মানে সেই ডাইনীর মেয়ের দেওয়া যাদুমন্ত্রে তার ছয় দাদারা সারাদিন রাজহাঁস হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াত আর কেবল সন্ধ্যের ওই আধ ঘন্টাই তাদের ডানার পালক খসিয়ে মানুষ হতে পারত;

পুরো ঘটনা জেনে ছোট মেয়েটা কেঁদে উঠল, সে তার দাদাদের বলল তোমরা কি রানীর দেওয়া এই যাদুমন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারোনা?

তখন তার দাদারা বলল, সে ভারি শক্ত উপায়; রাজহাঁস থেকে মুক্ত করার একটাই উপায় আর তা

হল ছ বছর ধরে তাদের ছোট বোন কোন কথা বলতে পারবেনা আর হাসতেও পারবে না আর এই ছ বছরে তাদের জন্য সাদা ঘাসের ছটা ছোট ছোট জামা তাকে বানাতে হবে ; জামা বানাতে বানাতে এই ছ বছরের মধ্যে যদি একটাও কথা সে বলে ফেলে কিমবা হেসে ফেলে একটুও তাহলে আবার শুরুর থেকে তাকে জামা বানাতে হবে; এই বলতে বলতে সন্ধ্যের সেই আধ ঘন্টা ফুরিয়ে গেল আর দাদারাও আবার রাজহাঁস হয়ে ওই পোড়ো বাড়ি থেকে উড়ে বনের দিকে ফিরে গেল।

সেই থেকে ছোট বোনও মনকে শক্ত করে প্রতিজ্ঞা করল যে করেই হোক তার নিজের প্রানের বিনিময়েও সে তার দাদাদের উদ্ধার করবে আর এই ভাবতে ভাবতে সেও ওই পোড়ো বাড়ি ছেড়ে বনের দিকে ফিরে গেল; যেতে যেতে যেতে অনেক দূরে একটা বড় গাছের নিচে এসে সে বসে পড়ল আর অনেক সাদা ঘাস এরমধ্যেই সে জোগাড় করেছে বনের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে; সেই ঘাস দিয়ে সে একমনে জামা বানাতে লাগল; ঠিক করল মুখে একটাও শব্দ করবে না আর হাসবেও না ছ বছরের জন্য যতক্ষন না দাদাদের জন্য সে ঘাসের জামা তৈরী করতে পারছে।

সেই গাছের নিচে বসে ঘাসের জামা বানাতে বানাতে রাজকন্যার অনেক দিন কেটে গেল; এরমধ্যে রাজকন্যা আরও বড় হয়ে গেছে, দেখতেও ভারী সুন্দর হয়ে গেছে। এমনই সময় একদিন পাশের রাজ্যের রাজা শিকারে এলেন সেই বনে; তার দলবল শিকার করতে করতে সেই গাছের কাছে এসে পৌঁছলো আর সুন্দরী রাজকন্যাকে দেখতে পেয়ে তার নাম জিজ্ঞেস করল; কিন্তু রাজকন্যা দাদাদের জন্য জামা সেলাই শেষ না করে কথা বলতে পারবেনা তাই শুধু মাথা নাড়লো; কিন্তু তাতে কিছুই বুঝতে না পেরে রাজার দলবল তার সর্ম্পকে আরও জানতে ইচ্ছুক হল; তারা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে। কিন্তু রাজকন্যা একটাও শব্দ করল না। তখন রাজার দলবল তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে তারা তার কোন ক্ষতি করবে না কিন্তু তাতেও রাজকন্যার মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটা বেরোলো না; রাজকন্যা দেখতে ছিল অপরুপ আর তার সরল মুখের দিকে তাকিয়ে রাজার সৈন্যদের খুব মায়া হল তাই তাকে তারা ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে এল রাজার দরবারে; রাজা তাকে দেখেই অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল তার সর্ম্পকে কিন্তু সব প্রশ্নেতেই রাজকন্যাকে চুপ থাকতে দেখে রাজার ও ভীষন মায়া হল আর রাজা ঠিক করলেন মেয়েটাকে তারই কাছে রাখবেন; এদিকে রাজকন্যাকে দেখতেও ছিল খুব সুন্দর আর রাজপুরীর সুন্দর সুন্দর সাজগোজে তাকে দেখতে আরও সুন্দর হয়ে উঠল; রাজা ঠিক করলেই এমন মেয়েই রাজরানী হওয়ার যোগ্য; আর যেমন ভাবা তেমনি কাজ; রাজা সেই হারিয়ে যাওয়া রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন কিছু দিন পরেই।

এদিকে, রাজার মা ছিল ভীষন চালাক আর বদমাশ, সে কিছুতেই রাজার এই বিয়ে মেনে নিতে পারছিল না তাই রাজকন্যাকে উঠতে বসতে রাজার মা খারাপ কথা বলতো আর ঝগড়া করতো; কিন্তু রাজকন্যা মুখ দিয়ে কোন শব্দ উচ্চারন করত না শুধু এক মনে তার দাদাদের জন্য ঘাসের জামা বানাতো। কিছুদিন পর রাজকন্যা তার প্রথম সন্তানের জন্ম দিল; রাজার মা যেন এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, সে সদ্য জন্মানো রাজপুত্রের মুখে খানিকটা লাল রং লাগিয়ে রাজার কাছে নালিশ করল রানী নাকি ডাইনী, তার ছেলেকে সে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু রাজা কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করলেন না কারন রানীকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। রানীরও তো মুখে রা নেই- এক মনে সে জামা সেলাই করে যাচ্ছে সাদা ঘাস দিয়ে।

আরও কিছুদিন পর রানি দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলে রাজার দুষ্টু মা আবার একই কান্ড ঘটালো, কিন্তু

এবারেও রাজা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না কারন রাজকন্যা কোন উত্তর না দিলেও রাজা জানতেন তার রানী এতটাই সহজ সরল যে সে এ কাজ করতে পারে না।

কিন্তু তৃতীয় সন্তানের জন্মের পর রাজার মা রানীর কাছ থেকে তার ছেলেকে চুরি করে লুকিয়ে রাখলেন আর রাজাকে এসে বললেন রানি তার সন্তানকে মেরে ফেলেছেন; রাজা অন্দরমহল থেকে রানী কে ডেকে পাঠালেন সবিস্তার ঘটনা জানার জন্য; কিন্তু রানি তো তার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কথা বলতে পারবেনা তাই মুখ থেকে একটাও শব্দ উচ্চারন করল না রানী। আর রাজা এবার পুত্রশোকে রেগে গিয়ে রানীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন আর তার শাস্তি স্বরুপ আগুনে মৃত্যুদণ্ড ঘোষনা করলেন। মৃত্যুদণ্ডের দিনও ঘোষনা করা হল। রাজার মা তো ভীষন খুশি।

দেখতে দেখতে মৃত্যুদণ্ডের দিন হাজির। আর সে দিনই আসলে সেই ছ বছর ধরে কোন কথা না বলে এতটুকু না হেসে রাজকন্যার সাদা ঘাসের জামা বানানোর শেষ দিনও ছিল। ছটা জামাও তার বানানো হয়ে গিয়েছিল। তাই যখন রাজকন্যাকে রাজার আদেশঅনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের জন্য ওপরে আনা হল, তখন তার হাতে করে সে ওই ছটা জামাও নিয়ে এসেছিল আর সারাক্ষন আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল কখন সেই ছটা রাজহাঁস উড়ে আসে; এদিকে ঠিক যখন রাজার আদেশ অনুযায়ী নিচে আগুন ধরানো হবে ওমনি সেই ছটা রাজহাঁস উড়ে এসে রাজকন্যার কাঁধে রাখা জামার কাছে এসে তাদের ডানার পালক ঘসলো আর সাথে সাথেই তাদের সব পালক খসে গিয়ে রাজহাঁসের ভেতর থেকে সুন্দর ছ ছটা রাজপুত্র বেরিয়ে এল; রাজা তো এসব দেখে অবাক; রাজার হুকুমে রাজকন্যাকে নিচে নামিয়ে আনা হল আর তারপর সে নিজে সমস্ত কথা রাজাকে খুলে বলল কারন এখন আর তার কথা না বলে থাকার কোন বিধিনিষেধ নেই; কিভাবে রাজার দুষ্টু মা তার তিন ছেলেকে লুকিয়ে রেখে তার নামে মিথ্যে দোষ দিয়েছে সে কথাও সে রাজাকে জানালো; সব শুনে আর রানীর ছয় ভাইকে কাছে পেয়ে রাজা ভীষন খুশি হল। সাথে সাথে রাজা তার মায়ের শাস্তিও দিল আর রাজার আদেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হল।

একদিকে রাজার আদেশে রাজার মায়ের শাস্তিও হল আবার অন্যদিকে রাজকন্যার দাদাদের ওপর থেকে সেই জাদুর মায়াও কেটে গেল। তারা আবার ফিরে পেল তাদের আগের চেহারা। আর তার সাথেই শেষ হল তাদের দুঃখের জীবন ; এর পর থেকে সেই রাজা রানী আর তার ছয় ভাই ওই রাজ্যে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে লাগল।

অনুবাদঃ
রমিত দে
কলকাতা

পড়ে পাওয়া: নাড়ুবাবুর পেন উদ্ধার

নাড়ুবাবু যখন সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেন তখন তাঁর ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলছে-রাগে, দুঃখে, হতাশায়! ওঃ এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দুটো পেন পকেটমার হয়ে গেল। প্রথমটা না হয় বাজে ছিল কিন্তু এবারেরটা একটা দামি সেফার্স। আর শুধু কি তাই? ওই সবুজ সেফার্সটা তিনি তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখার জন্য প্রাপ্ত মূল্যের টাকায় কিনেছিলেন। বড্ড পয়া পেন ছিল।

নাড়ুবাবু একজন উঠতি লেখক। ওই সেফার্সটা না পেলে তাঁর লেখার হাতই আসতে চায় না। এ তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন। পেনটা খুললেই প্লট, চরিত্র, ভাষা সব হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসতে থাকে। অন্য পেন নিয়ে চেষ্টা করে দেখেছেন - স্রেফ সময় নষ্ট। এক কলম লেখা এগোয়নি।
আর আজ কিনা সেই পেনটা গেল। নাড়ুবাবু আর ভাবতে পারেন না।

অফিস টাইমে বাসে উঠে পেন সামলাই বা কী করে? এদিকে আবার পেন নিয়ে না গেলেও চলে না। ওঃ, যা ভিড়! বিশেষত যাবার সময়। আসার সময় না হয় কিছুক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরে ভিড়টা কমে গেলে বাসে চাপেন। কিন্তু যাবার সময় তো আড় এক ঘন্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোনো যায় না। তা হলে যে খাওয়াই হবে না।

আর বাসে উঠে কোনরকমে রড আঁকড়ে ঝুলে থাকাই দায়। তার মধ্যে কি আর কে তার পকেটের ভার দয়া করে লাঘব করছেন, তার খেয়াল রাখা যায়? তিনিই তো কত সময় পয়সা বার করতে গিয়ে ভুল করে নিজের ভেবে অন্যের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছেন। অসম্ভব ব্যাপার।

তা পেন না হয় আবার হবে কিন্তু ওইটি না ফিরে পেলে যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের ইতি।

রাত্রে খাবার পর ছাদে উঠে ক্রমাগত পায়চারি করছেন। মাথাটা ঠাণ্ডা না হয়ে উত্তরোত্তর গরমই হয়ে উঠছে। প্রায় স্ফুটনাঙ্কে যখন পৌঁছেছে হঠাত সেই সময় বুদ্ধিটা বিদ্যুতের মত খেলে গেল। দেখা যাক কী হয়।মরিয়া হয়ে উঠেছেন নাড়ুবাবু। হ্যাঁ, ওইভাবেই চেষ্টা চালাবেন। যাক কিছু পয়সা আর পরিশ্রম।

কি চেষ্টা চালাবেন নাড়ুবাবু? তিনি কি তাঁর প্রিয় সেফার্সটাকে ফিরে পাবেন? জানতে হলে পড়ে ফেল নাড়ুবাবুর পেন উদ্ধার। বই এর বিবরণ এখানেঃ

গল্পসংগ্রহ
অজেয় রায়
লালমাটি
১০০ টাকা

(মূল বানান অপরিবর্তত রাখা হয়েছে)

পুরাণকথা: বোকা উগংয়ের গল্প

উত্তর চীনের হান ও জিঝু নদীর মধ্যিখানে প্রায় সত্তর মাইল এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক হাজার ফিট উঁচু তায়হাং-ওয়াংগু পর্বতদ্বয়।

অনেক অনেক কাল আগে ওই পর্বত দুটোর মাঝের সমতল অংশে কুটির বেঁধে বাস করতো এক নির্বোধ বুড়ো। নাম তার উগং।বয়স গড়িয়ে নিরানব্বই ছুঁয়েছে।ছেলেমেয়ে নাতিপুতি নিয়ে এমনিতে বেশ সুখের সংসার।অথচ বুড়োর মনে শান্তি নেই।অশান্তির স্রষ্টা আর কেউ নয়,ওই তায়হাং-ওয়াংগু!উগংয়ের আস্তানার দু'পাশে ওদের বিশাল উচ্চতার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে আশেপাশের সব দৃশ্যপট।মনে মনে চরম ক্ষোভ পুষেই দিন কাটছিলো বেচারার।কারণ বহু ভেবেও সমস্যাটার কুলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না!

শততম জন্মদিনের দিন যথারীতি বৃদ্ধের চোখ চলে গেলো তায়হাংয়ের দিকে।বুক চিরে উঠে এলো নীরব দীর্ঘশ্বাস!এই প্রকান্ড পাহাড় টপকে কোথাও বেড়াতে যাবার সামর্থ আজ আর নেই।ঘরে বসেই শেষ জীবনটা আদিগন্ত প্রকৃতি দেখে কাটাবে ভেবেছিলো,সেও হবার নয়!সমস্ত দিন বিছানা আঁকড়ে শুয়ে থাকলো উগং।বুড়ি নানা ভাবে চেষ্টা করলো স্বামীর গোসা ভাঙানোর।মোটে লাভ হল না।জীবনের এতোগুলো বছর ওই রাক্ষুসে পর্বত দুটোর আবডাল কত সহস্র অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে কে জানে!দুহাতে মুখ ঢাকলো বুড়ো।

প্রথম প্রথম সবাই ধরে নিয়েছিলো দিন কয়েক পেরোলে উগংয়ের ভিমরতি আপনিই দূর হবে।কার্যক্ষেত্রে দেখা গেলো ভিন্ন ছবি।পরিবারের লোকজন ব্যাপারটা যত মজার ছলে নিয়েছিলো,তেমন তো নয়!

ঠিক কী ঘটতে চলেছে কাউকে আঁচ করার সুযোগমাত্র না দিয়ে আচমকাই একদিন আত্মীয় বন্ধুদের জরুরী তলব পাঠালো বৃদ্ধ।চিঠি পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো যে যেখানে ছিলো।তার নিজের সন্তান এবং তস্য সন্তানাদি মিলিয়ে জমায়েত যা দাঁড়ালো,ঘরে মাছি গলার জায়গা নেই!আপনজনেরা একে একে সবাই উপস্থিত হলে উগং তার মনোবাসনাটি খোলসা করে জানালো।

ইচ্ছেটা এই প্রকারের: সে পায়ে হেঁটে পবিত্র হান নদী দর্শন করতে চায়।কিন্তু অতি বার্দ্ধক্যের কারণে অমন উঁচু পাহাড় ডিঙোনো তার পক্ষে অসম্ভব।সকলে একযোগে পাহাড় কেটে হান নদী পর্যন্ত একটা

সোজা পথ বানিয়ে দিলে বেচারার মনোকামনা পূর্ণ হতে পারে।

বৃদ্ধের আর্জি নাকচ করে কেউ তাকে কষ্ট দিতে চায় না।অতএব ছেনি হাতুড়ি কোদাল হাতে শুরু হলো অক্লান্ত পরিশ্রম।পাহাড় কাটা তো আর মুখের কথা নয়।মাসের পর মাস,বছরের পর বছর অবিশ্রান্ত পাথর ছেনেও মেদ ঝরানো গেলো না তায়হাং-ওয়ান্গুর।তবু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবার বান্দা কেউ নয়।

কান্ড দেখতে জনতার ভিড়ে হাজির ছিলেন প্রাজ্ঞ ঝিসউ।বোকা উগং ও তার বংশধরদের মূর্খামি দেখে তিনি তো হেসেই অস্হির।হায় হায় পাহাড় গুঁড়ো করার মত নির্বোধ ইচ্ছের কথা কে কবে শুনেছে! শেষে আর থাকতে না পেরে ঝিসউ ছুটে গেলেন উগংকে বোঝাতে।এমন নিষ্ফল খাটুনি বন্ধ করতে অনুনয় করলেন।

বুড়ো কোনো উপদেশ কানে তুলতেই নারাজ।তার সেই এক গোঁ; ''জানি, সময় ফুরিয়ে এসেছে।যে কোনোদিন যমের ডাকে সাড়া দিতে হবে আমায়।চলে যেতে হবে জীবনের পরপারে।তা বলে ভেবো না পাহাড় কাটার কাজ থেমে যাবে।আমার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র বংশপরম্পরায় মেটাবে আমার অতৃপ্ত অভিলাষ।ক্ষতবিক্ষত করবে দানব তায়হাং-ওয়ান্গুর উদ্ধত শরীর।দেখবো ওদের বৃদ্ধি থামে কিনা!''

উগংয়ের এহেন সংকল্পে কেঁপে ওঠেন স্বয়ং নগদেব।কী ঝামেলায় পড়া গেলো রে বাবা!আজ হোক কিংবা কাল,মনে হচ্ছে ছেলেপুলের দল পাহাড় গুঁড়ো করেই ছাড়বে!কথায় বলে,বিপদে পড়লে মানুষ শরণাপন্ন হয় ঈশ্বরের।তবে ঈশ্বরের বিপদে গতি কি?কার কাছে বুদ্ধি চাইবেন তাঁরা?নগদেব ধর্না দিলেন দেবতাকুলের হেড অর্থাৎ পরমেশ্বরের দরবারে।পরিস্হিতি সম্পূর্ণ বিচারবিবেচনা করে এবার তাঁকেও ঢোঁক গিলতে হলো।উগংয়ের অদম্য মানসিক দৃঢ়তার কাছে হার স্বীকারের জন্য মনে মনে তৈরী হলেন বিধাতা।শক্তির দেবতা কাওশির দুই বলবান পুত্রকে নির্দেশ দিলেন; বোকা মানুষটার দৃষ্টিপথ থেকে সরিয়ে পাহাড় দুটির একটিকে সুজু অঞ্চলের পূর্বে,অন্যটিকে ইয়াংজু অঞ্চলের দক্ষিণে প্রতিস্হাপন করতে।উগংয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।আর এক সরল বৃদ্ধের অসম্ভবকে সম্ভব করার উদ্ভট জেদের গপ্পটা চিরকালের তরে ঠাঁই পেয়ে গেলো পুরাণের ধূসর পাতায়।

শর্মিষ্ঠা খাঁ
দক্ষিণ কোরিয়া

স্বাধীনতার গল্প: পর্ব ২

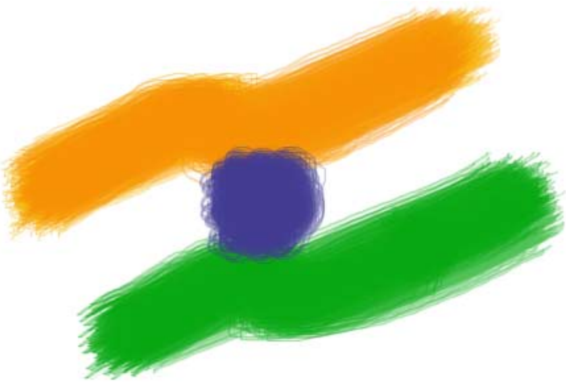

কি কেমন আছ তুমি? সেই পুজোর সময়ে দেখা হয়েছিল তোমার সাথে। এই শীত কেমন উপভোগ করছ? সব আমাদের লিখে জানিও কিন্তু।

তবে আমি কিন্তু একটা কথা জানি – এতো সব কিছুর মধ্যেও কিন্তু তোমার মনে সেই প্রশ্নটা লুকিয়ে আছে – 'ফারুকশিয়রের ফরমান'-এ কি এমন ছিল যে সারা বাংলায় আগুন জ্বলে উঠল?

আসলে কি জান, মোগল সম্রাট ঔরংজেবের পর কোনো মোগল সম্রাট-ই আর সেই বিশাল সাম্রাজ্যকে সেভাবে বেঁধে রাখতে পারেননি। নামেই তাঁরা সম্রাট ছিলেন।ফারুকশিয়র-ও তাই।তখন বাংলার নবাব ছিলেন মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনি বাংলার বুকে দাপটের সাথে স্বসাশন চালাতেন। মোগল সম্রাটের অধীনতা শুধু একটা তকমা ছিল।মোগল সম্রাটের নীতির বিরোধিতা করলেও তিনি কখনই তার অবমাননা করেন নি।

'ফারুকশিয়রের ফরমান'-বেশ জটিল ব্যাপার। তবে তোমাকে তো ব্যাপারটা জানতে হবে!তোমায় বরং চুম্বকে বলিঃ

ফারুকশিয়রের ফরমান অনুসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি
১) মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে বাংলায় বানিজ্য করার অধিকার পায়;
২)কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের পাশাপাশি আরও ৩৮-টি গ্রাম কেনার অনুমতি পায়।
৩)প্রয়োজনে মুর্শিদাবাদের অর্থাৎ বাংলার নবাবের ট্যাঁকশাল ব্যবহার করার অনুমতি পর্যন্ত লাভ করে।

১৭১৭ সালের এই ফর্মান কে ঘিরে বাংলার তখনকার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ এর সংগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ চরমে ওঠে, কারণ, মুর্শিদের মত প্রতাপশালী নবাবের পক্ষে এই ফর্মান নীরবে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। এর জন্যে বিরাট বানিজ্য শুল্ক ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। কোম্পানির নিঃশুল্ক বাণিজ্যের ফলে দেশীয় বণিকদের বিরাট ব্যবসা কমে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তবে নবাবের পক্ষে এই সনদকে অস্বীকার করা অসম্ভব ছিল, কারন নবাবের যতই ক্ষমতা থাক না কেন, আসলে তিনি ছিলেন দিল্লী-র সম্রাটের অধীনস্থ কর্মচারী। আইনতঃ সম্রাটের আদেশ মানতে তিনি বাধ্য। মুর্শিদ ছিলেন বিচক্ষণ নবাব। তাই তিনি সরাসরি এই সনদের বিরোধীতা না করলেও, পরোক্ষভাবে কোম্পানি যাতে এর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে না পারে, সে চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেন নি। মুর্শিদ কোম্পানিকে সরাসরি জানিয়ে দেন যে তারা কেবল আমদানি-রপ্তানী বানিজ্যে শুল্ক ছাড়ের সুবিধা পাবে; দেশের

মধ্যে ব্যবসার ক্ষেত্রে এই সুযোগ তারা পাবে না। কলকাতার কাছে ৩৮ তা গ্রাম কেনার ক্ষেত্রেও তিনি প্রবল বাধা সৃস্টি করেন। ওই সব গ্রামের জমিদারদের তিনি অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা কোম্পানিকে ওই সব গ্রাম বেচতে রাজী না হন। মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল ব্যবহারের কাজেও তিনি গোপনে বাধা দেন। মুর্শিদের এই প্রবল আভ্যন্তরীন প্রতিরোধের ফলে কোম্পানি বাংলার নবাবের সাথে বন্দোবস্ত করতে বাধ্য হন। বন্দোবস্তে এই ঠিক হয় যেঃ

১)কোম্পানির বাংলা থেকে রপ্তানি করা দ্রব্যের ওপর শুল্ক ছাড় দেওয়া হবে।

২) কোম্পানি বাংলার ভিতরের বাণিজ্যে দস্তকের ব্যবহার করতে পারবে না।

৩) কয়েকটি পণ্য যেমন লবণের ব্যবসা কোম্পানি করতে পারবে না।

৪) কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই দস্তকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু এত করার পরও কোম্পানির বানিজ্য বাড়তে থাকে খুব তাড়াতাড়ি। এই দস্তকের অপব্যবহার করে তারা শুল্ক ফাঁকি দিতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যে এই দস্তক ব্যবহার করা শুরু করে। এর ফলে বাংলার নবাবের প্রাপ্য শুল্কে বিরাট ফাঁকি পড়তে থাকে। অন্যদিকে দেশীয় বণিকরা শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করার ফলে তাদের ব্যবসা মার খেতে থাকে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে বারংবার অভিযোগ জানালে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেন। মুর্শিদকুলির যোগ্য উত্তরসুরী ছিলেন বাংলার নবাব সুজাউদ্দিন (১৭২৭-৩৯)। তিনি সরাসরি কোম্পানির বাণিজ্যে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করে তাঁদের পর্যুদস্ত করে তোলেন। নানা অজুহাতে ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে শুল্ক আদায় করতে থাকেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে তিনি কাশিমবাজার কুঠির 'ভকিল'-কে আটক করেন। সুজাউদ্দিনের কঠোর মনোভাবের জন্য ফারুকশিয়র অনুমোদিত দস্তকের অপব্যবহার খুবই কমে গিয়েছিল। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে তাঁর অযোগ্য পুত্র সরফরাজ। তিনি ছিলেন অপদার্থ ও অযোগ্য শাসক। তিনি সারাদিন বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকতেন। কোম্পানির বণিকরা এই চরম বিশৃঙ্খলার সুযোগ নেওয়ার আগেই বিহারের নায়েক নাজ়িম আলিবর্দী খাঁ গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। নবাব আলিবর্দী এককথায় বলতে গেলে বাণিজ্যের বাইরে বিদেশী বণিকদের ক্ষমতা বিস্তারের বিশেষ সুযোগ তিনি দেন নি। তিনি মনে করতেন ইউরোপীয় বণিকদের শ্রীবৃদ্ধির ওপর বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকটাই নির্ভরশীল। তবে কোনো সময়েই তিনি ইংরাজ বণিকদের অন্যায় দাবীর কাছে মাথা নোয়ান নি। প্রথমতঃ তিনি নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজ বণিকরা যাতে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে না পারে সে দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ছিল। বিদেশী বণিকরা নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি তা কঠোর হস্তে দমন করতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাব আলিবর্দীর আমলে ইংরেজ বণিকরা বাংলায় ব্যবসা করা ছাড়া বিশেষ কোনো ক্ষমতার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারেন নি।

এর পর কি হল?...জানি তোমার রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা রইল। কি করব বল, তোমার-আমার অন্য বন্ধুদের ও তো জায়গা দিতে হবে, না কি!

আর্য চ্যাটার্জি
কলকাতা

শিল্পের ইউরোপ: পর্ব ২

১) প্যারিসের কথা মনে পড়লেই প্রথম যে ছবিটা মনে পড়ে তা হল পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য আইফেল টাওয়ার। এই সুবিশাল ধাতব নির্মান এক সময়ে এই বলেই ভেঙ্গে ফেলার কথা হয়েছিল কারণ স্থপতি গুস্তাভ আইফেলের এই কীর্তি প্যারিস শহরের কুদ্রষ্টব্য বলে গণ্য হয়েছিল কারণ শহরের আর কোনো শিল্পকীর্তির সঙ্গে এই আকাশচুম্বি স্থাপত্যের সাদৃশ্য ছিল না। তথাপি, এখন সারা প্যারিস বাসীর কাছে আইফেল টাওয়ার হল শহরের চিহ্ন। বলা হয়, এই পৃথিবীর ওপরে এই সুউচ্চ টাওয়ার ঠিক ততটাই

ভার রেখেছে যতটা ভার একটা কাঠের চেয়ার এই পৃথিবীর ওপর রাখে।

২) নেপোলিয়ানের সময়ে ফ্রান্সের হয়ে যে সব সৈন্যরা লড়াই করেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই তোরণ তৈরী করা হয়। এই স্মৃতি-সৌধের গায়ে আমরা দেখতে পাই অসংখ্য খোদাই করা শীল্পকীর্তি।

৩) প্যারিস শহরের সব চেয়ে বড় সঙ্গমস্থল হল "প্লেস ডে লা কনকর্ড"। এই জায়গায় এক ফোয়ারার ওপর আমি দেখতে পাই কোনো অনামা শীল্পির ছোঁয়ায়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই নারী মূর্তি।

৪) লুভ (Louvre) মিউসিয়াম বলা হয় বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মিউসিয়াম শিল্প সংগ্রহের দিক থেকে। সেই মিউসিয়ামে কয়েক ঘন্টা কাটানোর সুযোগ এসে যায়ে।

৫) সব বিখ্যাত ভাস্কর্য ও তৈলচিত্রের মধ্যেও নজর কাড়ে এমন সব নাম না জানা শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায়ে তৈরী এমন নিখুঁত শিল্প। খোদাই করা পাতা গুলোর দিকে খেয়াল কর।

৬) ১৭৯৩ সালে শিল্পী অ্যান্টনিও কানোভা পাথর কেটে যেন সঙ্গীত সৃষ্টি করেন। এটি বিখ্যাত ভাস্কর্য - "ইরস এট সাইকে"।

৭) মার্বেলের এই মূর্তি তৈরী হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ বা তারও আগে। গ্রীক দেবী "নাইকি"-র এই বিশাল মুর্তি শোভিত আছে লুভ মিউসিয়ামে।

৮) লুভ মিউসিয়ামের ডেনন উইঙ্গে দেখতে পেলাম শিল্পের মধ্যে বিজ্ঞাণের ব্যাবহার। কত সুন্দর ভাবে এক পায়ে ভারসাম্য রেখে এই শিল্প সৃষ্টি করেছেন শিল্পী।

৯) লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মোনা লিসা তো সবার চেনা। লুভ মিউসিয়ামে গিয়ে আমিও চাক্ষুষ করেছি পৃথিবীর সব থেকে বিখ্যাত সেই ছবি। তবে দা ভিঞ্চির আরো অনেক ছবি আছে এই মিউসিয়ামে। যেমন এই "ম্যাডোনা অন দ্যা রক্স্"। এটিও দা ভিঞ্চির অন্যতম বিখ্যাচ এক তৈলচিত্র।

১০ ও ১১) শিল্পী জঁ লুই ডেভিডের আঁকা দুই ছবির অনপুঙ্খ। প্রথমটি “দ্যা কোরোনেশান অফ নেপোলিয়ান”। কাপড়ের সুক্ষ্য কারুকার্য কি অসাধারণ নৈপুন্যের সঙ্গে এঁকেছেন শিল্পী। দ্বিতীয়টি হল “ইন্টারভেনশান অফ স্যাবাইন উওম্যান”। ঘোড়ার চোখ গুলো যেন জীবন্ত।

১২) লুভ মিউসিয়ামের বিখ্যাত কাঁচের উল্‌টো পিরামিড, “চ্যালিস অ্যান্ড দ্যা ব্লেড”।

১৩) পূর্ব নির্মিত হলেও, প্রধানত রাজা লুই দ্যা ফোরটিন্থের সময়েই প্যালেস অফ ভারসাই স্বমহিমায়ে তৈরী হয়ে এবং তখনকার দিনে পৃথিবীর সবথেকে বড় প্রাসাদ হিসেবে গণ্য হয়। ঘুরতে ঘুরতে পৌছে

গেছিলাম সেই প্রাসাদেও। তার-ই মধ্যে এক হলঘরের উর্ধ্বাংশের দেওয়ালে তৈলচিত্রে ঠাসা। কি মহা আড়ম্বরে থাকতেন তখনকার রাজা রাণী!
সেইরকমই এক ছবির অনুপুঙ্খ পরের ছবিতে (১৪)।

১৫ ও ১৬) প্যালেস অফ ভারসাই-এর প্রাসাদের বাইরের দেওয়ালের দুটি ভাস্কর্যের খুটিনাটি।

লেখা ও ছবিঃ
ঋতম ব্যানার্জী
কলকাতা

বায়োস্কোপের বারোকথা: কলকাতায় প্রথম যুগের সিনেমা -পর্ব ২

(গত সংখ্যার পর)

ধীরে ধীরে ছবি তোলার রাজত্বেও একটা শৃঙ্খলা ও নিয়ম কানুনের পত্তন হল। যেমন তেমন করে ছবি তোলার বদলে ছবিরও কারখানার মত স্টুডিও তৈরি হল, যেখানে নিযুক্ত থাকতেন ক্যামেরাম্যান, সম্পাদক, অন্যান্য কলাকুশলী এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। এরকম স্টুডিও বলতে আমাদের মনে আসে কলকাতার নিউ থিয়েটার্স, মহারাষ্ট্রের পুনেতে প্রভাত স্টুডিও আর বম্বে টকিজ, আর চেন্নাইয়ের চন্দ্রলেখার কথা। এই স্টুডিওগুলির ঘরানাই ছিল আলাদা আলাদা। বম্বে টকিজের হিমাংশু রায় আর দেবীকা রানীর ছবির সঙ্গে প্রভাত স্টুডিওর ধর্মমূলক ছবির তেমন কোন মিল ছিল না। যেমন, দক্ষিণের নাচ গান আর দেব-দেবী ভরা ছবির সাথে নিউ থিয়েটার্সের সাহিত্যধর্মী ছবির কোনও মিল ছিল না।

দেবীকা রানী

যাক, আমরা কলকাতায় ফিরে আসি। এসময়ে দেখতে পাব, শব্দ ও সনলাপ ব্যবহার করার সুযোগ বাংলা ছবিকে অনেকটাই পালটে দিয়েছে। এই বদলে দেওয়ার প্রথম বড়মাপের চিহ্ন ১৯৩৩ সালে তৈরি 'চন্ডীদাস'। মধ্যযুগের বাঙালি বৈষ্ণব কবি চন্ডীদাসের সঙ্গে সমাজের নীচুতলার মানুষ রামি ধোপানির ভালবাসার গল্পটিকে সিনেমার পর্দায় নিয়ে এলেন দেবকী কুমার বসু। সেই যুগে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে

রাজনীতির স্তরে যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে,সেই ভাবনা এই ছায়াছবিকেও ছুঁয়ে গেছিল। 'সবার ওপরে মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই' - চন্ডীদাসের এই মর্মকথা সেদিন মানুষের মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল, যে আমাদের দেশে এই ছবিটিই প্রথম সিল্ভার জুবিলি করে।

যখন জনপ্রিয়তার কথাই বলা হল, তখন আমাদের ১৯৩৫ সালে মুক্তি পাওয়া 'দেবদাস' ছবিটির কথা বলতেই হবে। এই ছবি ৩০ দশকের মাঝামাঝি ডবল ভার্সানে (হিন্দি এবং বাংলাতে) তৈরি করা প্রথম ছবি ও আজকের ভাষা ব্যবহার করে বললে- সত্যিকারের ব্লক-বাস্টার। এই ছবিতেই আমরা প্রথম স্টার সিস্টেম বা নক্ষত্রব্যবস্থার সূচনা দেখলাম। আসামের জমিদার ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র প্রমথেশ বড়ুয়া বা বড়ুয়াসাহেব দর্শকের কাছে হয়ে উঠলেন ভালবাসার আঘাতে চুরমার হয়ে যাওয়া যুবকদের প্রতিনিধি। এই 'দেবদাস' ছবির যে কত পুণঃনির্মান হয়েছে তা বলে শেষ করা যাবেনা। মাত্র কিছুদিন আগেইন তৈরি হয়েছে একই গল্পের ওপর ভিত্তি করে 'দেব-ডি' ছবিটি। আজ হয়ত অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু একসময়ে বড়ুয়াসাহেবের চলন বলন সব কিছুই সারা দেশে অনুকরণ করা হত।

প্রমথেশ বড়ুয়া আর যমুনা বড়ুয়া

দেবকী কুমার বসু এবং প্রমথেশ বড়ুয়া দুজনেই মূলতঃ নিউ থিয়েটার্সের ছাদের তলায় বার করতে পেরেছিলেন কিভাবে ছবিতে গল্প বলতে হয়। বড় বড় লেখকদের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ রচনার কাজে ডেকে নিয়ে নিউ থিয়েটার্স তাঁদেরকে সেই সুযোগ করে দিল। সে যুগের অনেক বড় লেখকই- যেমন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সলিলানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়- ছবির চিত্রনাট্য লেখার কাজে মন দেওয়ায় আমাদের সিনেমাতে একটা ভাল গল্প বলার ঘরানা গড়ে ওঠে।

তার সঙ্গে সঙ্গে প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবিতে সম্পাদনার বৈশিষ্ট ও ইন্ডোর শুটিং এ আলোর ব্যবহার বেশ অভিনব ভিল। ঋত্বিক ঘটক একথার উল্লেখ করেছেন। যেমন সত্যজিৎ রায় স্বীকার করেছেন দেবকী কুমার বসুর ছবিতে নতুনত্বের কথা।যদি আমরা বাংলা ছবির ইতিহাসের এই সব পথীকৃৎদের কথা ভুলে যাই, তাহলে ইতিহাসকেই তো ঠিক ভাবে চিনতে পারব না।

এইরকমই আরেকটি প্রচন্ড জনপ্রিয় ছবি ছিল ১৯৩৭ সালে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের পক্ষ থেকে মধু বসুর

তৈরি করা 'আলিবাবা' ছবিটি। এই ছবির "ছি ছি এত্তা জঞ্জাল" গানটি আজ পর্যন্ত আমরা গুন গুন করে গাই।

কানন দেবী

কারিগরী দিক থেকেও যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছিল। মধু বসু রিফ্লেক্টর আর ব্যাক লাইট খুব সফল্ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। পরিচালক হিসাবে বড়ুয়া সাহেবের ছিল হলিউড ঘরানার আলোকসম্পাতের প্রতি তীব্র মনোযোগ। ইতিমধ্যে নীতিন বসু বাংলা ছবিতে প্লেব্যাক প্রবর্তন করেন। ফলে খুব সহজেই বিখ্যাত গায়ক গায়িকাদের ঠোঁটে বসিয়ে দেওয়া যাচ্ছে। ছবিঘরগুলি আর শুধু বিদেশী ছবির আধিপত্যে থাকল না, আমাদের বাঙালি পরিবারের ভাই বোন বন্ধুরা সবাই বড়ুয়াসাহেব আর কাননবালার ভক্ত হয়ে উঠলেন।

বলতেই হবে, এত কিছুর পরেও সিনেমা ঠিক প্রকৃত অর্থে শিল্প হয়ে ওঠেনি। কিন্তু চল্লিশের দশকে এল কিছু রূপান্তর। মুক্তি পেল প্রথমে ১৯৪৪ সালে 'উদয়ের পথে', ১৯৮৭ এ 'কল্পনা' আর ১৯৫১ সালে 'ছিন্নমূল'। সেই রূপান্তরের গল্প পরের পর্বে।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক
চলচ্চিত্র বিদ্যা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

পরশমণি: সমুদ্রের জল আর বৃষ্টির জল

তুমি কি ঋককে চেনো? চেনোনা। কি করে চিনবে? তোমার সাথে ত আর আলাপ নেই।

আসলে ও আমার এক ছোট্ট এক বন্ধু। তার মনে নানা প্রশ্ন, তার অনেকগুলোই শুনলে চমকে উঠবে তোমরাও। কেমন উদ্ভট উদ্ভট প্রশ্ন তা শোন, যেমন, একটা বাসের সংগে একটা বাঘের লড়াই হলে কে জিতবে, অথবা একটা লরির সাথে যদি শূওরের লড়াই হয় তাহলেই বা কে জিতবে--এমনি সব প্রশ্ন।

তুমিই বল এমন সব কথার কোন উত্তর হয়?

কিন্তু সেই ঋকই একদিন ধাঁ করে জিজ্ঞেস করে বসলো, সেদিন যে বললে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে মেঘ হয় আর সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, তাহলে সমুদ্রের জল নোনতা হলে বৃষ্টির জল নোনতা নয় কেন?

এ প্রশ্নটা কি উড়িয়ে দেবার মত? মোটেই নয়। তাই এড়িয়ে যাওয়া গেল না।

যতই বলি, এখন সময় নেই, পরে বলব ততই চেপে ধরে। এখনই শোনা চাইই চাই তার। অগত্যা কি আর করা।

তোমারও শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে ত? ঠিক আছে। কিন্তু তাহলে ত আবার সেই রান্না ঘরে গিয়েই ঢুকতে হয়। কি রাজি? এর আগেও ত অনেকবার গিয়েছি সেখানে, তাই না? চল আর একবার যাই।

এবার মাকে বলে কয়ে একটা সসপ্যান নিয়ে নাও,আর এর মধ্যে অর্দ্ধেকের মত জল নাও। বড় এক চামচের মত নুন (লবন) ঐ জলে নিয়ে ভাল করে মেশাও যাতে সবটা মিশে যায়। একটু চেখে দেখ, জলটা নোনতা লাগবে।

এবার মা'কে বল গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে তাতে নুনজলটা চাপিয়ে দিতে। প্রথমে শোঁশোঁ আওয়াজ উঠবে, তারপর জলটা বুরবুর করে, শেষে টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এই সময় দেখবে জল থেকে খুব ধোঁয়া

উঠছে। ঠিক বললাম? উঁহু, ভুল হল। কেন বলত? নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার যে জল থেকে যে ধোঁয়া ওঠে আসলে তা ধোঁয়া নয়, সেটা জলীয়বাষ্প। ফুটন্ত জল থেকেই ঐ বাষ্প উঠছে। এ প্রসঙ্গে আগে বলেছি। তাইত? না কি?

এবার একটা কাজ করলে একটা কান্ড দেখতে পাবে। একখানা স্টিলের বড় থালা সাঁড়াশী দিয়ে ধরে সসপ্যানের ওপর এমন ভাবে ধর যাতে থালাটার একদিক একটু কাত হয়ে থাকে আর বাষ্প সরাসরি উঠে থালার গায়ে লাগে। নিজে না করাই ভাল, বরং মা'কেই একটু ধরে থাকতে বল।

কি দেখতে পাবে বলত? প্রথমে থালার বাষ্প লাগা দিকটা ঘোলাটে হয়ে যাবে, তার পর বিন্দু বিন্দু জল জমতে শুরু করবে। কেননা থালাটা বাষ্পের তুলনায় ঠান্ডা, তাই গরম বাষ্প ঠান্ডার পরশে জলবিন্দুতে পরিণত হবে। এইভাবে বেশ কিছুটা জল জমলে জলবিন্দু গুলো বড় বড় ফোঁটার আকারে থালার গা যেদিকে কাত করা আছে সেদিক বেয়ে নীচে পড়তে থাকবে।

একটা পরিষ্কার বাটিতে এই জল সংগ্রহ কর। এবার একটু জল চেখে দেখত নোনতা কিনা ! কি? নোনতা লাগছে? মোটেই না। একদম সাধারন জলের মত ! সসপ্যানের জলটাও এখন একবার চাখ, দেখবে সেই নোনতাই রয়েছে।

ব্যাপারটা কি হল তাহলে? একই জল ছিল ত! একবার নোনতা, আর একবার সাধারন জল--এটা কি রকম হল!

কি হল আসলে সেটা বলি। যখন নূনজলে তাপ দেওয়া হল আর সেটা ফুটতে শুরু করল তখন তা থেকে তাপ পেয়ে শুধু জলই বাষ্প হয়ে ওপরে উঠে গেল আর জলবিন্দুর আকারে থালাতে জমতে শুরু করল, তারপর বাটিতে জমল। নূন ত আর বাষ্প হয় নি, তাই সেটা সসপ্যানের জলেই থেকে গেল। সুতরাং বাটির জল সাধারন জলের মত হবে নাতো কি ! এখানে একটা কথা বলে রাখি। জলে নূন না মিশিয়ে চিনি মেশালেও একই ব্যাপার হত। নীল রঙের তুঁতে মিশিয়ে দিলেও একই ফল হবে, বাটিতে সংগ্রহ করা জল কিন্তু নীল না হয়ে সাধারন জলের মতই হবে। এই ধরনের ঘটনাকে বলে 'পাতন' প্রক্রিয়া। দূষিত জলকে এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা হয়। অসুখ হলে ইঞ্জেকশন দেবার সময় এই জল ব্যাবহার করা হয়, ইংরাজীতে এর নাম distilled water বা পাতিত জল। এই পাতন করার জন্য অবশ্য আমি যে ভাবে বললাম তেমন করে হয় না, এর জন্য আলাদা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় যার নাম 'পাতনযন্ত্র'।

এখন ঋকের প্রশ্নের উত্তর কি হতে পারে বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।

সূর্যের তাপে সমুদ্রের নোনা জল থেকে জলটা বাষ্পিভুত হয়ে সোজা ওপরে উঠে যায়, আর ওপরের ঠান্ডা আবহাওয়ায় সেই বাষ্প জমে জল হয়ে মেঘের আকারে জমা হয়।

এই জমা জল থেকেই না বৃষ্টি হয়! তাহলে আর বৃষ্টির জল নোনতা হবে কি করে, তোমরাই বল।

বৃষ্টির জল হয়ে গেল সাধারন জলের মত আর নূনটা পড়ে থাকল সমুদ্রের জলে। বৃষ্টির জলকে সাধারন জল বললাম বটে, ও জল কিন্তু একদমই সাধারন নয়, একেবারে বিশুদ্ধতম জল। এই জল নিশ্চিন্তে পান করা চলে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে। বৃষ্টি শুরু হলেই এই জল সংগ্রহ করা

চলবে না, একটু পরে করতে হবে, কেননা প্রথমদিকের জলে বাতাসের ধুলোময়লা মিশে যেতে পারে। তাতে জল দূষিত হয়ে পড়বে।

তুমি বড় হয়ে যখন রসায়নের (chemistry) বই পড়বে তখন এ বিষয়ে আরও অনেককিছু জানতে পারবে।

দেখ, ঋকের সাথে সাথে তুমিও অনেক কিছু শিখে গেলে!

তাহলে ঋক যা বলে সবটাই উদ্ভট নয়।

কিছু জানতে হলে তুমিও প্রশ্ন করতে পার, সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করব, কেমন?

সন্তোষ কুমার রায়
কোদালিয়া, কলকাতা

আঁকিবুকি

মোহর কুন্ডু
ষষ্ঠ শ্রেনী
ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, পাটুলী, কলকাতা

শুভম গোস্বামী
দ্বিতীয় শ্রেণী
ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, পাটুলী, কলকাতা

ঊর্বী মুখার্জি
দ্বিতীয় শ্রেণী
ক্যালকাটা পাবলিক স্কুল

মধুরিমা গোস্বামী
ষষ্ঠ শ্রেনী
ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, পাটুলী, কলকাতা